কার্তিক ১৩৮৫

আনন্দমেলা

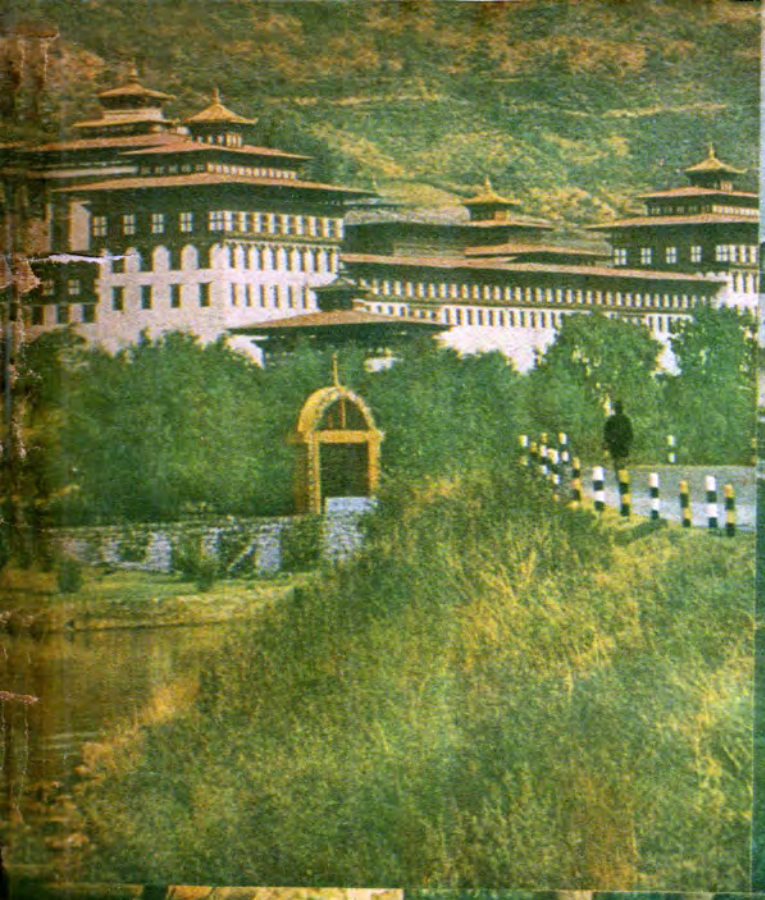

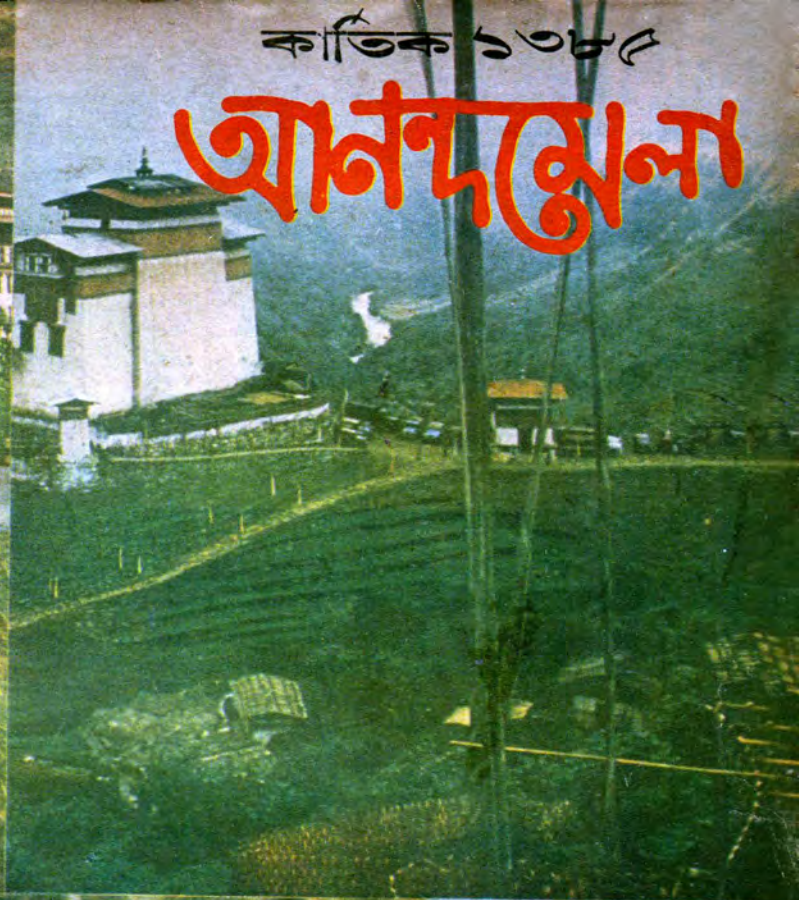

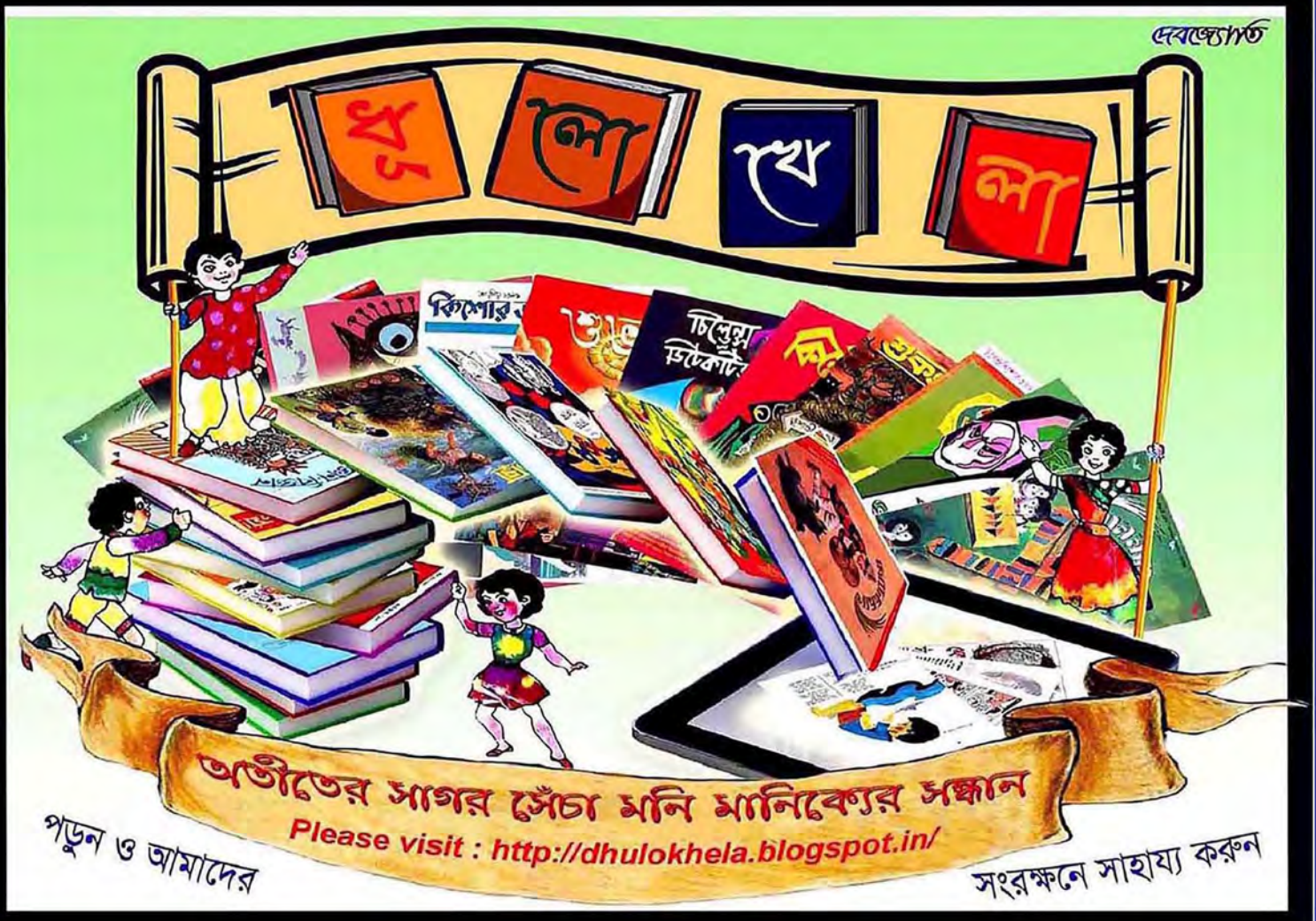

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান আভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

যখন খুশি মুখে দিন মজার মিষ্টি নিউট্রিন

নিউট্রিন-এর
সুইট ও টফি

হ্যাঁ, এই তো সেই খাসা মিষ্টি, যা বছরের পর বছর ধরে
ভারতের অন্যান্য সব শহরে বাচ্চাদের মন কেড়ে নিয়েছে।
এবার সেই মিষ্টি এই শহরেও হাজির...
বাচ্চাদের মুখে সারাদিন 'চাকুম-চুকুম' চলতেই থাকবে।
আজই কিছু নিউট্রিন মুখে দিন, এরপর তফাৎটা শুধু বুঝুন।

nutrine

চাকুম-চুকুম খাসা
মিষ্টি দিয়ে ঠাসা

নিউট্রিন কনফেকশনারী কোম্পানি লিমিটেড
প্যালামানের রোড
চিত্তুর ৫৭১ ০০২, অন্ধ্র প্রদেশ

CAS/NC-20/78 BEN

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার
কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র

আনন্দমেলা

কার্তিক ১৩৮৫, অক্টোবর ১৯৭৮, চতুর্থ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা
দেড় টাকা

ছড়া
বটিকা । প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৩

গল্প
ছোটমাসির মেয়েরা । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৪
রজনীবাবুর গল্প । বাণীব্রত চক্রবর্তী ১৯

উপন্যাস
ভুতুড়ে কুকুর । আশাপূর্ণা দেবী ৯
অলৌকিক । বিমল কর ৩৮

আত্মকথা
খেলতে খেলতে । চুনী গোস্বামী ১৫

বিশেষ রচনা
আমার ভিনুভাই । পঙ্কজ রায় ৪১

ভ্রমণ-কাহিনী
অপরূপ ভুটান । দীপঙ্কর সেন ২৩

কমিক্‌স
বিশ্বকাপ-ফুটবল ২১ ● গোয়েন্দা বাজ ২৫ ● টারজান ২৬ ● টিনটিন ৩০

খেলাধুলো
কমনওয়েলথ গেম্‌স ও আমরা । মুকুল দত্ত ৪৫
সানি খেলছে, রেকর্ড ভাঙছে । ফাইটার ৪৭
আপ্পা রাও । তপু দাশগুপ্ত ৪৭
ইস্টবেঙ্গল আবার উঠে আসছে । শ্যামসুন্দর ঘোষ ৪৮
আলি আবার সম্রাট । সুব্রত সরকার ৪৯
খেলার মাঠে নতুন মুখ । পুষ্পেন সরকার ৫০
শীল্ড থাকল কলকাতায় । অশোক দাশগুপ্ত ৫১

লেখাপড়া
সেন্ট জন্'স ডায়োসেশান গার্লস' হাইস্কুলের প্রধান-শিক্ষিকা কী বলেন ৩২
কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল ৩৩
মজার পড়া । কুন্তক ৩৬
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৩৭

ধাঁধা-মজা-রহস্য
শব্দ-সন্ধান ২৮ ● ধাঁধা ২৮ ● কিসের ফোটো ২৯
উত্তর বটে ২৯ ● মজার খেলা ২৯ ● শুধু একবার ২৯ ● আটখানা ২৯

অন্যান্য লেখা
তোমাদের পাতা ২২ ● দুঃসাহসিক অভিযান ৩৭ ● মণিমেলার খবর ৫২
আঁকো ৫৪ ● শেখো ৫৪

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে ভুটানের কিছু আলোকচিত্র ব্যবহৃত হয়েছে

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি·আই·টি· রোড কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

ছোটমাসির মেয়েরা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা শহরে বাঘ, ভাল্লুক কিংবা গণ্ডার নেই বটে, তবে কিনা চোর ডাকাত আর ছেলেধরা সবসময় গিসগিস করছে। আমার ছোটমাসির কাছে তাই এই শহরটাও গভীর জঙ্গলের মতন। সব সময় সাবধানে থাকতে হবে।

ছোটমাসির দুই মেয়ে, রুমু আর ঝুমু। ওদের আরও দুটো বেশ ভাল-ভাল নাম আছে বটে, কিন্তু সে-দুটো বেশ শক্ত, রুমু ঝুমু নামেই সবাই চেনে। ছোটমাসি তাদের এক মিনিটের জন্যও চোখের আড়াল করেন না। নেহাত ইস্কুলের সময়টুকু ছাড়া। তাও ছোটমাসি ওদের ইস্কুলে পৌঁছে দেন, দুপুরে টিফিনের সময় যান, আবার বিকেলে যান নিয়ে আসতে। রুমু আর ঝুমু পড়ে ক্লাস এইট আর নাইনে। ওরা বেশ বড় হয়ে গেছে, নিজেরাই স্কুলে যাওয়া-আসা করতে পারে, কিন্তু তার কোনো উপায়ই নেই, ছোটমাসি সবসময় ওদের পাহারা দিয়ে রাখতে চান যে!

আমি একদিন বলেছিলাম, "এই তো বাড়ির কাছেই স্কুল, ওরা তো হেঁটেই চলে আসতে পারে, কত ছেলেমেয়ে আসে।"

ছোটমাসি চোখ গোল-গোল করে বললেন, "আর যদি ছেলে-ধরা ওদের ধরে নিয়ে যায়? ও পাশের পার্কটায় কয়েকটা বিচ্ছিরি চেহারার লোক বসে থাকে, দেখলেই আমার কী রকম যেন সন্দেহ হয়!"

আমি বললাম, "ছেলেধরা ওদের ধরবে কেন? ওরা তো ছেলে নয়!"

ছোটমাসি তখন এক ধমক দিলেন, "তুই চুপ কর। তুই কিছু বুঝিস না!"

টিফিনের সময় গিয়ে ছোটমাসি কড়া নজর রাখেন ওরা যাতে কোনোরকমে ফুচকা বা ঝালমুড়ি না খেয়ে ফেলে! রুমু-ঝুমুর ক্লাসের বন্ধুরা মনের সুখে আলুকাবলি আর ঘুগনি-চটপটি খায়, কিন্তু ওদের সেদিকে যাবারই উপায় নেই। ছোটমাসির চোখের সামনে বসে ওদের বাড়িতে-তৈরি খাবার খেতে হয়।

আমি অবশ্য মাঝে-মাঝে লুকিয়ে-চুরিয়ে ওদের ডালমুট, চানাচুর আর হজমি গুলি খাওয়াই। যদিও জানি, ধরা পড়ে গেলে ছোটমাসির হাতে আমাকেও বোধহয় মার খেতে হবে!

ছোটমাসির ধারণা, চোরডাকাতের মতন অসুখের জীবাণুরাও সব সময় আমাদের চারপাশে ওত পেতে আছে। কখন যে তারা মুখ দিয়ে নাক দিয়ে ঢুকে পড়ে তার ঠিক নেই। সেইজন্য বাইরের কোনো জিনিস খাওয়া ওঁর মেয়েদের একদম বারণ।

একদিন আমি ছোটমাসির বাড়ির রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিলাম। দেখি কী, সেখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখটা একটা কাপড় দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ছোটমাসি, ও কে?"

ছোটমাসি বললেন, "ও-ই তো আমাদের রান্নার ঠাকুর!"

"ওর মুখ বাঁধা কেন?"

"ব্যঃ মুখ বাঁধা থাকবে না? আমার রান্নাঘরে মুখ-খোলা কারুকে ঢুকতে দিই না। মনে কর, দুধ জ্বাল দিচ্ছে কিংবা ঝোল রাঁধছে, এমন সময় আপন মনে কথা বলে ফেলল! আর কথা বললেই একটু থুতু ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে! তাহলে ওদের সেই থুতুমাখা জিনিস আমরা খাব?"

"রান্না করতে করতে আপন মনে কথা বলবে কেন?"

"যদি বলে? হঠাৎ বলে ফেলতেও তো পারে!"

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, "আমরা কথা বলার সময় তো থুতু বেরোয় না!"

ছোটমাসিও হাসতে-হাসতে বললেন, "একটু-একটু বেরোয়, চোখে দেখা যায় না! স্বাস্থ্য-বইতে লেখা আছে!"

আর একদিন দেখেছিলাম ও বাড়ির বাজার করা। সব বাড়ির লোকেরা বাজারে যায় থলি নিয়ে। আর ছোটমাসির চাকর যায় একটা বড় প্ল্যাস্টিকের বালতি নিয়ে, সেটায় আবার জল ভরা থাকে। সেই বালতিতে করে আনা হয় জ্যান্ত মাছ। ছোটমাসি তখন দাঁড়িয়ে থাকেন দোতলার বারান্দায়। চাকর বালতি থেকে মাছটা তুলে ছুঁড়ে দেয় উঠোনে। তখন মাছটা যদি দু' তিনবার লাফায় তাহলে ছোটমাসি খুশি। আর যদি বেচারা মাছটা লাফাতে না পারে অমনি ছোটমাসি বলবেন, যা, এক্ষুনি ফেরত দিয়ে আয়!

ছোটমাসিদের দুধ নেওয়া হয় বাড়ির সামনেরই একজন গোয়ালার কাছ থেকে। দুধ দোয়াবার সময় ছোটমাসি রোজ সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন যাতে একফোঁটাও জল মেশানো না হয়। এ-ব্যাপারে তিনি ঠাকুর-চাকরদেরও বিশ্বাস করেন না। শুধু তাই নয়, তিনি আর-একটা কাণ্ডও করেন। সেটা অবশ্য আমি নিজে দেখিনি, তবে শুনেছি। দুধ দোয়াবার আগে নাকি ছোটমাসি রোজ সেই গরুকে দশখানা জেলুসিল ট্যাবলেট গুঁড়ো করে খাইয়ে দেন। গরুর যদি অম্বল হয়, তাহলে সেই দুধ খেয়ে ওঁর মেয়েদেরও অম্বল হবে সেইজন্য এই ব্যবস্থা।

এই তো গেল খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার। কিন্তু কলকাতার রাস্তাঘাটে তো অনেক নোংরা থাকে, আর নিশ্বাসের সঙ্গে তার গন্ধও নাকে ঢুকে যায়। রাস্তায় বেরুলে নিশ্বাস তো নিতেই হবে! সেইজন্য ছোটমাসি মেয়েদের নাকেরও ব্যায়াম করান।

প্রত্যেক শনি-রবিবার ছোটমাসি দুই মেয়েকে নিয়ে চলে যান ঠাকুরপুকুর। সেখানে ওঁদের আর-একটা চমৎকার বাড়ি আছে। সাদারঙের তিনতলা বাড়ি, মস্তবড় বাগান, সবটাই উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা, একদিকের দেয়ালের পাশে একটা ছোট্ট পুকুর। এখানে থাকেন রুমু-ঝুমুর দাদু আর দিদিমা।

এখানে ছোটমাসি মেয়েদের নিয়ে আসেন টাটকা হাওয়া খাওয়াতে। এখানে ধুলোবালি নেই, কাছাকাছি কোনো কল-কারখানা নেই বলে বাতাসে ধোঁয়া নেই, খুবই স্বাস্থ্যকর জায়গা।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ছোটমাসি রুমু-ঝুমুকে নিয়ে চলে আসেন সেই বাড়ির ছাদে। তারপর তাদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বলেন, "নিশ্বাস নে! ভাল করে নিশ্বাস নে!"

ঠিক ড্রিল মাস্টারের মতন ছোটমাসি সামনে দাঁড়িয়ে থেকে বলেন, "নিশ্বাস নে, এবার ছাড়, ছাড়। আবার নে!"

খানিকক্ষণ এরকম করার পর ছোটমাসি বলেন, "এবার হাঁ করে খানিকটা হাওয়া খেয়ে ফ্যাল! এরকম টাটকা হাওয়া তো কলকাতায় পাবি না!"

রুমু-ঝুমু মায়ের সব কথা শুনে যায় লক্ষ্মী মেয়ের মতন। ওরা বুঝে গেছে, প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই। ছোটমাসির মনটা বড্ড নরম, কেউ ওর কথায় কোনদিন প্রতিবাদ করলেই উনি অমনি কেঁদে ফেলেন!

এত সব করেও রুমু-ঝুমুর চেহারা বেশ সুন্দর হয়েছে, পড়াশুনোতেও ওরা ভাল। ছোটমাসির এরকম বাড়াবাড়ি দেখে আমরা মাঝে-মাঝে হাসাহাসি করি বটে, তাতে কিন্তু ছোটমাসি চটে যান না। নিজেও হেসে ফেলে বলেন, "তবুও দ্যাখ না, এত সাবধানে থেকেও কি সবসময় ভাল জিনিস পাওয়ার উপায় আছে? সেদিন ওদের খাওয়ার জন্য খুব বেছে বেছে ছোলা ভিজিয়ে দিলুম, তারপর ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে দেখি কী, একটা ছোলা পোকায় ফুটো করা!"

একদিন আমি ছোটমাসিদের বাড়িতে দুপুরে বেড়াতে গেছি। ছোটমাসি তখন স্নান করছিলেন। বাথরুম থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর চোখ দুটি কপালে উঠে গেছে, মুখে দারুণ ভয়ের চিহ্ন!

আমিও ভয় পেয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল?"

ছোটমাসি বললেন, "হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, আর তারপরেই যা বুকটা কাঁপতে লাগল..."

"কী কথা?"

"তুই জানিস, পৃথিবীর তিনভাগ জল আর এক ভাগ স্থল?"

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এটা আবার একটা নতুন কথা নাকি? এতে ভয় পাবারই বা কী আছে?

আমি বললাম, "তাতে কী হয়েছে?"

ছোটমাসি বললন, "পৃথিবীর তিনভাগ জল এটা আগে খেয়াল করিনি! তার মানে আমার মেয়েরা তো কখনো-না-কখনো জলের ধারে যাবেই। এদিকে আমি ওদের সাঁতার শেখাইনি! ওরা ডুবে যাবে যে! কালই যদি ডুবে যায়?"

আমি হাসতে লাগলাম।

ছোটমাসি বললেন, "ধর, ওরা লেখাপড়ায় খুব ভাল হল। তারপর বিলেত-আমেরিকায় গেল....."

আমি বললাম, "তা তো যেতেই পারে।"

"তখন সমুদ্র পেরিয়ে যেতে হবে...মনে কর, সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্লেন যাচ্ছে, হঠাৎ প্লেনটা ভেঙে গেল আর ওরা সমুদ্রে গিয়ে পড়বে...তখন যদি সাঁতার না জানে, উরিব্বাবাঃ, কী সাংঘাতিক ব্যাপার হবে!"

"বালাই ষাট, ওদের প্লেন কেন ভাঙবে! তবে যদি প্লেন ভেঙেই যায়, তখন অত উঁচু থেকে সমুদ্রে পড়লে..."

"প্যারাসুট থাকবে তো! প্লেনে প্যারাসুট থাকে না?

মীনা বন্ধুকে সাহায্য করলো!

দিনে-দুবার নিউট্রামূল খাওয়া অভ্যেস করলে আর ভাবনা থাকে না। এই জন্যেই দেশের হাজার হাজার লোক সব ছেড়ে এখন আমূলের তৈরী শক্তিবর্ধক পানীয় নিউট্রামূল ধরেছেন।

আমূল মিল্কের ঘন ক্রীমের পুষ্টিতে ভরপুর নিউট্রামূলে আছে—আসল কোকো, মল্ট আর চিনি।

আর আশ্চর্য্য! এত গুণ সত্বেও নিউট্রামূলের দাম কম। নিউট্রামূলের ৫০০ গ্রা. টিন মাত্র ১২ টাকা ২১ পয়সা স্থানীয় কর, সেণ্টাল সেলস্ ট্যাক্স ও মাসুল আলাদা।

মীনা এবং আরো অনেকে নিউট্রামূল খেতে দারুণ ভালোবাসে!

আমূল-এর
নিউট্রামূল
প্রতি কাপ কর পান, হয়ে ওঠো পালোয়ান!

daCunha/N/2o/Ben/R-1

প্যারাসুটে করে জলে নামবে, তারপর তো সাঁতার জানতে হবে।"

আমি কল্পনা করতে লাগলুম প্লেন থেকে প্যারাসুট নিয়ে আমাদের রুমু আর ঝুমু নামছে আটলান্টিক মহাসাগরে, তারপর জলপরীদের মতন সাঁতার কাটতে লাগল।

"যদি জাহাজে করে যায়, জাহাজও তো ফুটো হয়ে যেতে পারে?"

"তা তো বটেই!"

"পরশু থেকে ওদের গরমের ছুটি। পরশু থেকেই আমি ওদের সাঁতার শেখাব!"

"ঠিক আছে আমিই সাঁতার শিখিয়ে দেব ওদের।"

"তুই সাঁতার শেখাবি? কোথায়?"

"কেন, গঙ্গায়।"

"গঙ্গায়? সাঁতার না শিখেই কেউ গঙ্গায় নামে? রোজ কত লোক ডুবে যায়।"

"তা হলে বালিগঞ্জের লেকে?"

"ধুত্, ওখানে একগাদা লোক সাঁতার কাটে। কত রকম নোংরা থাকে জলে...।"

ছোটমাসি উঠে পড়ে লেগে গেলেন তাঁর দুই মেয়ের সাঁতার শেখাবার ব্যবস্থা করতে। যে-কোনো জায়গায় তো ছোটমাসি মেয়েদের সাঁতার শেখাতে রাজি হতে পারেন না। একদম পরিষ্কার জল চাই, সেই জলে আবার ওষুধ ফেলতে হবে। তার আগে মেয়েদেরও নিতে হবে নানারকম ইঞ্জেকশান।

ছোটমাসির নানান জায়গায় চেনাশুনো। শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যবস্থা করে ফেললেন কলকাতার খুব বড় একটা ক্লাবের সুইমিং পুলে। তাও অন্য সকলের সঙ্গে নয়। খুব ভোরবেলা যখন কেউ যায় না, সেই সময় আগের দিনের জল বদলে নতুন জল ভরা হবে, তাতে মেশাবেন ছোটমাসি তাঁর নিজস্ব ওষুধ। এবং সাঁতার শেখাবার জন্য ছোটমাসি ঠিক করলেন একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে। ছোটমাসির ধারণা, যারা ইংরিজি বলে তারা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, রুমু-ঝুমু এর আগে কখনো মায়ের কথার অবাধ্য না হলেও সাঁতার শিখতে রাজি হল না। দুজনেই বলল, জলে নামতে ওদের ভয় করে।

এদিকে ছোটমাসি একটা জিনিস ধরলে কিছুতেই সেটা মাঝপথে ছাড়েন না। ওদের কত করে বোঝালেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "এত ভয় কিসের? দেখবি একদিন-দুদিন নামলেই ভয় কেটে যাবে। ভাল ট্রেনার থাকবে। দরকার হলে আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব!"

মেয়েরা তবু শুনতে চায় না। কাচুমাচু মুখ করে বলতে লাগল, "এ বছর না, পরের বছর!"

সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক, এখন মেয়েরা রাজি না হলে কি চলে? কত কষ্ট করে ছোটমাসি সেই ক্লাবের লোকদের রাজি করিয়েছেন আলাদা ব্যবস্থা করবার জন্য। সুতরাং ছোটমাসি কাঁদতে শুরু করলেন।

কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগলেন, "আমি তোদের ভালর জন্য এত সব করি। আর তোরা আমার কথা শুনবি না? সাঁতার না শিখলে কবে হঠাৎ ডুবে যাবি, পৃথিবীর তিনভাগ জল, এক ভাগ স্থল!"

সুতরাং শেষ পর্যন্ত রুমু-ঝুমুকে রাজি হতেই হল।

যেদিন প্রথম সাঁতার শিখতে যাওয়া হবে সেদিন আমিও ভোরবেলা গিয়ে হাজির হলাম। ওদের উৎসাহ দিতে হবে তো! রুমু-ঝুমুর মুখচোখে খুব ভয়-ভয় ভাব। তখনও বলছে, "মা, আজ না গেলে হয় না? বড্ড ভয় করছে!"

ছোটমাসি খুব নরম গলায় বললেন, "দেখিস, কোনো ভয় নেই। আমি তো পাশেই থাকব।"

সেই ক্লাবে গিয়ে সুইমিং পুলের কাছে দাঁড়িয়ে রুমু আর ঝুমু এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠল। ওদের ট্রেনার মেয়েটি জলে নেমে দাঁড়িয়ে আছে। সে অবাক। আমরা আরও বেশি অবাক। ভয়ের চোটে রুমু-ঝুমুর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

ছোটমাসি বললেন, "ওমা, তোরা ওরকম করছিস কেন? ভয় নেই! ভয় নেই!"

ওরা আরও জোরে হেসে উঠল।

ছোটমাসি বললেন, "থাক, থাক, ভয় পাচ্ছে। ওদের নামতে হবে না!"

রুমু আর ঝুমু অমনি লাফিয়ে পড়ল জলে। ছোটমাসি আঁতকে উঠলেন যেন।

তারপরই দেখলাম একটা মজার দৃশ্য। ট্রেনার মেয়েটি ওদের দু'জনকে ধরতে আসতেই ওরা পাশ কাটিয়ে ঝপাস ঝপাস করে সাঁতার কেটে দূরে চলে গেল। খুব পাকা সাঁতারুর মতন।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটিও হেসে উঠল। ছোটমাসি প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারেননি। তিনি ভ্যাবাচাকা খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল? মেয়েটি হাসছে কেন?"

আমি বললাম, "ওর বোধহয় খুব হাসিখুশি স্বভাব!"

তারপর ছোটমাসি বললেন, "ওরা অতদূর চলে গেল কী করে? সাঁতার না জেনেও সাঁতার কাটছে?"

আমি বললাম, "তোমারই মেয়ে তো। তুমি খুব ভাল সাঁতার জান, তাই ওদের আর শেখার দরকার হয়নি!"

রুমু-ঝুমু এই সময় টুপ করে ডুবে গেল। আর ওঠেই না, ওঠেই না। তখন ছোটমাসি খুব ভয় পেয়ে নিজেই শাড়ি-টাড়ি পরা অবস্থায় জলে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, আমি ওঁর হাত টেনে ধরলাম। রুমু-ঝুমু ডুবসাঁতার কেটে অনেক দূরে গিয়ে ভুশ করে আবার মাথা তুলল।

এবার ছোটমাসি বুঝলেন। গালে হাত দিয়ে বললেন, "ওমা ওরা সাঁতার জানে? এই, তোরা কোথায় সাঁতার শিখলি? কবে শিখলি?"

রুমু-ঝুমু চিত-সাঁতার কাটতে-কাটতে উত্তর দিল, ঠাকুরপুকুরে।"

ছোটমাসি আরও অবাক হয়ে বললেন, "ঠাকুরপুকুরে ওরা কোথায় সাঁতার শিখল?"

আমি বললাম, "ঠাকুরপুকুর নাম যখন, নিশ্চয়ই সেখানে অনেক পুকুর আছে।"

ছোটমাসি বললেন, "পুকুর কোথায়? আমাদের ঠাকুরপুকুরের বাড়িতে একটা নোংরা ডোবা আছে। সেটা তো পানায় ভরা, কেউ নামে না!"

রুমু-ঝুমু বলল, "আমরা সেটাতেই সাঁতার শিখেছি।"

"কে শেখাল?"

"কেউ শেখায়নি! নিজে-নিজে!"

ছোটমাসি ধপাস করে একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে বললেন, "হায়, হায়, কী হবে? একা-একা সাঁতার শেখা কী সাঙ্ঘাতিক কথা! আর ঐ বিচ্ছিরি নোংরা পুকুর, কতকাল ওর জল পরিষ্কার করা হয় না, সেটাতে নেমেছে আমার মেয়েরা! ওরা বেঁচে আছে, কী করে? হাঁরে নিলু, কী হল বল তো!"

আমি বললাম, "সত্যিই তো, ওরা বেঁচে আছে কী করে! খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার!"

রুমু-ঝুমু তখন মনের আনন্দে জল তোলপাড় করে সাঁতার কাটছে!

ছবি বিমল দাশ

জেমসের মজার আসর

১০০১ টি পুরস্কার জিতে নাও!

যে সংখ্যাটি নেই সেটি কি ?

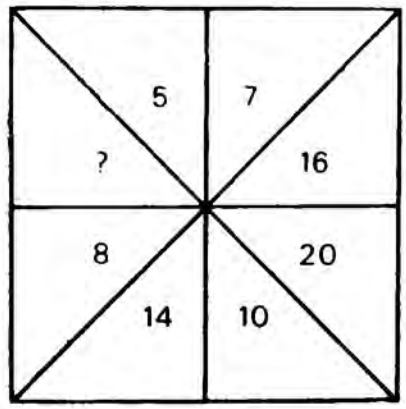

বড় স্পষ্ট হরফে শুধু ইংরেজিতে তোমাদের উত্তর আর নাম ও ঠিকানা লিখবে। এই ঠিকানায় পাঠাও :

"Fun with Gems"
Dept. D-23
Post Box No. 56,
Thane 400 601
Maharashtra

উত্তর পৌঁছবার শেষ তারিখ :
১৭ই নভেম্বর, ১৯৭৮

শিগগির!

তোমাদের উত্তর আর সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস্ জেমসের একটি খালি বড় (৩০ গ্রামের) প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ১০০১ জন যারা সঠিক উত্তর পাঠাবে তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফ্‌ট চেক পাবে।

রঙ-বেরঙের চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস্

CHAITRA-C-193 BEN

উপন্যাস

ভুতুড়ে কুকুর

আশাপূর্ণা দেবী

আগে যা ঘটেছে

বজ্রাঙ্গসুন্দরের বয়স সত্তরের বেশি। চিরকাল তাঁর শখ ছিল, একটি তেজীয়ান কুকুর পুষবেন। ছবির মতো বাড়ি করেছেন, কিন্তু হায়, তাঁর জ্যাঠাইমা সিংহবাহিনীর জীবদ্দশায় কুকুর পুষবার উপায় নেই। হঠাৎ একদিন বিকেলবেলার ভ্রমণ সেরে বাড়িতে ফিরে বজ্রাঙ্গসুন্দর একটি কুকুর দেখতে পান। মস্ত অ্যালসেশিয়ান, কিন্তু বেওয়ারিশ। জ্যাঠাইমা বলেছেন, না-পুষলেও কুকুরকে খাবার দিতে দোষ নেই। খাবার দিতে গিয়ে কুকুরটিকে কিন্তু দেখা গেল না। কেন? বজ্রাঙ্গসুন্দর তাকে ছড়ি দিয়ে খোঁচা মেরেছিলেন। সেই জন্যেই সে অভিমানে উধাও হল নাকি? তারপর—

২

বজ্রাঙ্গ বটব্যাল এ-বাড়ির বড়কর্তা হলেও 'বড় গিন্নি' বলে কিছু নেই বাড়িতে। মানে ছিলই না কোনোদিন। মিলিটারি-ম্যান ও-সব ফালতু ঝামেলা জোটাবার সময়ই পাননি। কাজেই ছেলেমেয়ে বলেও কিছু নেই তাঁর। ভাইপো গৌরাঙ্গসুন্দরই তাঁর সব। তার জন্যেই এই 'পরীর ওড়না' বানানো।

বাড়িটা সত্যিই সুন্দর।

রিঙ্কু তো প্রথম দেখে একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির পিছন দিকে কতখানি বাগান, দু'দুটো পেয়ারাগাছ, সত্যিকার জামরুল ফলে রয়েছে এমন একটা জামরুল গাছ, ইয়া ঝাঁকড়া একটা কালোজাম গাছ, লম্বা-লম্বা নারকেল গাছ, তা ছাড়া আরো সব কত কী। ওইখান থেকে লেবু তুলে-তুলে এনে কেটে খাওয়া হয়, কাঁচা লঙ্কা-টঙ্কাও নাকি ছিঁড়ে নিয়ে আসা হয়। কী অদ্ভুত!

একতলাই বাড়ি। বাগানের দিকে মুখ করা একখানা তিন-দিক-ঢাকা বড় বারান্দা, আর সেইখানেই খাবার টেবিল পাতা। বাগানের শোভা দেখতে-দেখতে খাও, আর খেতে-খেতে বাগানের হাওয়া খাও।

বজ্রাঙ্গ বলেন, "তার মানে—সঙ্গে সঙ্গে হজম, দু ঘণ্টা পরেই 'কী খাই কী খাই'। সাধে কি আর খাশ কলকাতা ছেড়ে এই শহরতলিতে এসে বাসা করেছি রে। খাশ কলকাতার মধ্যে পেতাম এত জায়গা? পেতাম এত খোলা হাওয়া?"

তা কথাটা ঠিক।

এদিকটায় মানে এই কুসুম বিথান-এর এদিকটায় কেমন যেন মফস্বল-মফস্বল হাওয়া, আর সে-হাওয়া প্রাণভরে খাওয়ার জন্যে ব্যবস্থার কমতি করেননি বজ্রাঙ্গ বটব্যাল। পুরো বারান্দাটা বাহারি গ্রীল দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন, খাও, কত হাওয়া খাবে খাও। অথচ কাকপক্ষী বেড়াল-ফেড়াল ঢুকতে পারবে না। ঝড়বৃষ্টির সময়? ঝপাঝপ ভারী ত্রিপলের পর্দা ফেলে দাও।

বড় খাশা এই বারান্দাটি, খাবার টেবিলের কাছাকাছি আঁচাবার জন্যে একটি বেসিন, তার পাশের দেওয়ালে ব্র্যাকেটে তোয়ালে সাবান রাখা আছে। কোথাও কোনো অসুবিধে রাখেননি বজ্রাঙ্গসুন্দর ভাইপোদের জন্যে।

সিংহবাহিনীর?

তাঁর তো সবই নিজস্ব হাতের কাছে। হাঁটতে ইচ্ছে করলে একটা লাঠি নিয়ে হাঁটেন, হাঁটতে ইচ্ছে না-হলে চাকা-দেওয়া চেয়ারে চেপে সারা বাড়ি পয়লট করে বেড়ান।

বারান্দাটার একদিকে তো বাগান, বাকি তিনদিক ঘিরে ছটা ঘর।

একদিকের দুটো তো ওই সিংহবাহিনীর একার, বাকি চারখানার মধ্যে একখানা বজ্রাঙ্গসুন্দরের নিজের, একখানা রিংকু আর তার মা-বাবার, একখানা রিংকুর নিজের দাদু-দিদার, মানে তার বাবার বাবা আর বাবার মায়ের। দাদু সর্বাঙ্গসুন্দর বটব্যাল চিরকাল বেনারসের বাসিন্দা, —ডাক্তার মানুষ, দারুণ পসার, রুগিদের ছেড়ে আসবার জো নেই। দাদা বজ্রাঙ্গসুন্দরের পত্রাঘাতে-পত্রাঘাতে কাহিল হয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে এসে দু-দশ দিন থাকেন। তা হলেও নতুন বাড়িতে তাঁদের ঘরটি বজ্রাঙ্গর ঠিক নিজের ঘরটির মতই সাজানো গোছানো খাট, আলমারি ইত্যাদি দিয়ে, তাছাড়া সব ঘরেই যেমন একদিকের দেওয়াল-জোড়া দেওয়াল-আলমারিতে আছে বই সাজানো, তেমনি এ-ঘরেও।

আলমারির মাথার কাছে একটি পিতলের বুদ্ধমূর্তি, সেও তিনটি ঘরেই একরকম। তিনটি—মানে বজ্রাঙ্গর, সর্বাঙ্গর, আর গৌরাঙ্গর।

শেষ ঘরখানার সাজসজ্জা আলাদা—এটা গেস্টদের জন্যে সাজানো থাকে। বাড়ি হয়ে পর্যন্ত কাউকে আসতে দেখেনি রিংকু। শুনছে শিগগিরই না কি তার বাবার জামাইবাবু, ইয়ে আর কি রিংকুর পিসেমশাই আসবেন।

খাবার জায়গার দিকটা বাড়ির পিছন দিক, সামনের দিকে গেট থেকে উঠেই মোজেক বারান্দার উপর লম্বা একখানা হলঘর, হরেক মাল দিয়ে সাজানো, বড়দাদু যেটাকে ড্রইংরুম বলেন। এই ঘরেই টেলিভিশন আছে। এ অঞ্চলে রিংকুদের এই বাড়িটার মতন এমন চমৎকার বাড়ি আর একখানাও নেই। সে জন্যে বাড়ির আর কারুর অহঙ্কার না থাক, ফটিকের দারুণ অহংকার। ফটিক অন্যবাড়ির লোকজনের সঙ্গে গ্রাহ্য করে কথাই বলে না।

আর ঘরমোছার লোক দামিনী বলে, "বাবাঃ বাড়ি বানিয়েছে বটে একখানা। মুছে সাফ করতে করতে হাত ব্যথা হয়ে যায়। কেন? ছোট মোটো বাড়ি বানালে কী হয়?"

রিংকুর কিন্তু ভীষণ ভাল লাগে ছুটির দিনে সারা বাড়িটায় ঘুরে বেড়াতে। কেমন যেন গা সিরসিরে একটা আহ্লাদ জাগে। ...কিন্তু একটাও যদি সঙ্গী থাকত। অন্তত একটা কুকুরও যদি পুষতে দিতেন কত্তামা!

ও কথাটা এখনো প্রাণে জাগে বজ্রাঙ্গর। আহা, ওই অ্যাল-সেশিয়ানটার মতো 'ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক ঘোঁ ঘোঁ' আওয়াজওলা একটা কুকুর যদি রাখতে পারতেন বাড়িতে, তাহলে চোরের ভয়ও থাকত না।

যাক, কী আর করা। তবে ওটাকে একটু খেতে টেতেও দিতে পারতেন যদি।

নাঃ, ছাড়ির খোঁচা দেওয়াটা খুব গর্হিত হয়েছে।

রাত্রে খেতে বসে আর-একবার বললেন, "ফটকে, সেটাকে দেখতে পেলি না?"

ফটিক মুখ ঘুরিয়ে বলল, "না।"

রিংকুর বাবা অবাক হয়ে বলেন, "কাকে?"

রিংকুর মা, রিংকু আর ফটিকের মুখে একটু রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে।

"কী হল? কী ব্যাপার?"

"ও কিছু না," বজ্রাঙ্গ বলেন, "তুমি খাও তো। হ্যাঁ বৌমা,

মনে আছে তো কাল গোবিন্দগোপাল আসছে, রান্নাটান্নাগুলো তুমিই কোরো, ফটকে যেন নাক গলাতে না আসে। ...আর গোরা, তোর তো কাল ছুটি, গাড়িটা নিয়ে একেবারে সো-জা নিউমার্কেটে চলে যাবি। নিউমার্কেটে ছাড়া বড় গলদা চিংড়ি পাবি না তুই। জানিস তো গোবিন্দগোপাল ওটা দারুণ ভালবাসে।"

রিংকুর মা দুষ্টুহাসি হেসে বলেন, "জামাইবাবু কোন খাদ্যটাই বা দারুণ ভাল না বাসেন জ্যাঠামশাই?"

বজ্রাঙ্গ দরাজ গলায় বলেন, "হেলথ ভাল তাই। তোমাদের মত অনাহারী বাবা, আর নিখাকি মা বুঝি ভাল? যে কটা দিন থাকবে গোবিন্দগোপাল, আমিও একটু স্বস্তি করে খেয়ে বাঁচব। তোমাদের সঙ্গে খেতে বসে তো লজ্জাই করে আমার। ফটকে, আর খান চারেক রুটি দে। আঃ, বাতাসটা বড় মিঠে আসছে তো।"

প্রচুর পরিমাণে রুটি, তরকারি, ডাল, মাছ এবং হাওয়া খেয়ে বজ্রাঙ্গ শোবার ঘরে ঢুকে, বেশ টাইট করে দরজার খিলটি এঁটে, বইয়ের আলমারিটি খুললেন।

চারিদিক তাকালেন।

খোলা থাকার মধ্যে বারান্দার দিকের জানলাটি। তা সেদিকে আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। বাগানটা সম্পূর্ণ ভিতর দিকে। সাড়ে ছ' ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, তার উপর আবার দু ফুট কাঁটাতারের জালমারা। জালের উপরটা খোঁচা-খোঁচা। পাঁচিলের গায়ে কোথাও দরজা তো দূরের কথা, একটা ঘুলঘুলি পর্যন্ত নেই।

কিন্তু থাকলেই বা কী হত?

বজ্রাঙ্গ বটব্যাল খুলছেন তো একটা বইয়ের আলমারি, এত চারিদিক তাকাবার কী আছে?

আলমারি খুলে বই নিলেন বটে বজ্রাঙ্গ, খান চার-পাঁচই নিলেন বার করে, কিন্তু পড়লেন না একখানাও। বই টেনে বার করে খালি জায়গাটার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী ভেবে আবার বই কটা ঢুকিয়ে রেখে আলমারির চাবি বন্ধ করে, চাবিটা ওর মাথার ওপরকার বুদ্ধমূর্তির পিছনে রেখে, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

বজ্রাঙ্গ বটব্যালের স্বাস্থ্য ভাল, শুতে শুতেই ঘুম। আর টানা সারারাত বজ্রগর্জনে নাক ডাকিয়ে একেবারে সকালে ওঠেন। স্বপ্নও দেখেন কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আজ কী হল, মাঝরাত্তিরে হঠাৎ স্বপ্নের ঘোরে মনে হল, বজ্রাঙ্গ নিজে যেন সেই অ্যালসেশিয়ানটা হয়ে গিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। আর...আর সেই অ্যালসেশিয়ানটা বজ্রাঙ্গসুন্দর হয়ে জানলা দিয়ে ছড়ির খোঁচা মারছে তাঁকে।

ইশ! কী বিশ্রী স্বপ্ন।

ধড়ফড়িয়ে ঘুম ভেঙে গেল বজ্রাঙ্গর, দেখলেন ঘামে গা ভিজে গেছে। ইশ, কী কাজই করেছিলেন তখন। সেই ছড়ির খোঁচাটা! স্বপ্ন ভাঙতে আলো জ্বাললেন, আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিরীক্ষণ করে দেখলেন। কুকুরের আদল-ফাদল এসে যায়নি তো? নাঃ, কোথাও তো কোনো বদল হয়নি। যেমন ছিলেন, তেমনিই আছেন।

খারাপ স্বপ্ন দেখার মতো খারাপ আর কিছু নেই। স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পর আবার ঘুমিয়ে পড়েও, বজ্রাঙ্গর ঘুমের মধ্যেও কেবলই মনে হতে থাকে একটা কুকুর তাঁর আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খুচ খুচ শব্দ করছে, কোথায় যেন গরম নিশ্বাস ফেলছে।

অথচ বাগানের খোলা জানলা দিয়ে চমৎকার বাতাস আসছে।

কিন্তু এটা কী? এটা?

না, রাত্তিরে চোখে পড়েনি, সকালে চোখে পড়ল, মশারির দেওয়ালে বেশ একখানা খোঁচা। তিন কোনা খোঁচা। জানলার ধারের দেওয়ালে।

শোবার সময় নিশ্চয়ই ছিল না। নতুন নাইলনের মশারি।

বার বার দেখেও মানে খুঁজে পেলেন না; কী করে হল? কী হতে পারে?

মশারির খোঁচাটা মনের মধ্যে খোঁচা মারতে থাকল সারাক্ষণ।

গোবিন্দগোপাল আসছেন ভূপাল না নেপাল কোনখান থেকে যেন, এসে পৌঁছতে নাকি সেই বিকেল, কিন্তু সকাল থেকেই বাড়িতে 'সাজ-সাজ' রব পড়ে গেছে। রিংকুর বাবা গেছেন নিউমার্কেটে, রিংকুর মা এখন থেকেই রান্নাঘরের দিকে ঘোরাঘুরি করছেন, কত্তামা থেকে থেকেই ভাঙা গলায় হাঁক পাড়ছেন, "দামিনী, ঘরবাড়ি ভাল করে সাফ করবি, বাড়িতে জামাই আসছেন। ...ফটকে, তুই যেন সেই মোক্ষম সময়ই হঠাৎ হাওয়া হয়ে থাকিসনি, গাড়ি থেকে মালপত্তর নাবাতে হবে।... নাতবৌ, রান্নায় যেন ঝাল বেশি দিও না, নাতজামাই ঝাল খেতে পারে না। ...গোরা, ঠিক সময় গাড়ি নিয়ে ইস্টিশানে যাবি। ...বজা, তুই যেন আবার জামাইয়ের ওপর মেজাজ দেখাসনি, তোকে বিশ্বাস নেই। যা মেজাজ তোর।"

একসময় আর থাকতে না পেরে ফটিক বলে উঠেছিল, "বাবা, বাবা। কত্তামা এমন করছে, যেন গুরুঠাকুর আসছে।"

সিংহবাহিনী এক ধমক লাগিয়েছেন, "আ গেল যা, কথা শোনো লক্ষ্মীছাড়ার। গুরুঠাকুরের বেশি তা জানিস? কথায় বলে জামাতা না দেবতা। ...তায় আবার সে একটু তেজিয়ান ছেলে।"

ফটিক বিড়বিড় করে বলে, "এ সোংসারে কে যে তেজিয়ান নয়। বাদে ফটকে হতভাগা!"

তেজিয়ান? আহা রে। কী তেজিয়ান। তেজিয়ানরা শ্বশুর-বাড়ি এসে এত খায়?

তেজিয়ান জামাইয়ের হ্যাংলার মতো খাওয়া দেখে ফটিক তো মনে মনে হেসেই খুন। এসে মাত্তরই তো ইয়া বড় এক গেলাশ শরবত আর এক থালা ফল খেলেন, খানিক পরেই চা আর দু প্লেট হরেক-মাল খাবার, সন্ধেবেলা আবার একপ্রস্থ কফি আর কাজু বাদাম। পাতে কিছু ফেলার নাম নেই।

ফটিকদের গ্রামে চাষীবাসির ঘরেও জামাইরা খেতে বসে পাতে কিছু ফেলে। পেটে খিদে রেখেও ফেলে। আর ইনি নাকি সাহেব, বাজপেয়ী সাহেব।...সুটকেসের ওপর কার্ড ঝুলতে দেখেছে ফটিক—জি জি বাজপেয়ী।

ফটিককে পড়তে দেখে রিংকু দুষ্টুমি করে বলেছিল, "খুব তো পড়তে শিখেছিস ফটিকদা। বল দিকি, জি জি বাজপেয়ীর পুরো নামটা কী হতে পারে?"

গোবিন্দগোপাল তখন চানের ঘরে ঢুকছিলেন। দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠলেন, "কেন, তুমি জানো না? নিজের পিসের নাম জানো না?"

রিংকু বলে ওঠে, "আমি জানব না কেন? ও খুব বাহাদুরি করে ইংরিজি পড়ছে তো, তাই বলছি—"

আসলে ফটিকের মাস্টার মশাই এই রিংকুই, কাজেই পড়া-ধরবার অধিকার তার আছে।...

"পুরোনাম? পুরোনাম? জি জি জি জি..." ফটিক বলে ওঠে, "ও বুঝেছি, গোবরগণেশ বাজপেয়ী।"

"অ্যাঁ, কী বললে?"

গোবিন্দগোপাল ছিটকে এসে তার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েন আর কী!

"গোবরগণেশ! জি জি দিয়ে আর কোনো নাম মনে এল না তোমার ?...অ্যাঁ ? গোবর গণেশ ! তাহলে তুমি—আমার অফিসের বি বি চৌধুরীকে কী বলবে? বেহেড বুদ্ধু চৌধুরী? আর কে কে বোসকে ? ক্যাবলকান্ত বোস ? বলি—এন সি মল্লিককে? বলো কী বলবে? ন্যাকাচণ্ডী মল্লিক ? বলো, বলো হে পণ্ডিত। আর তোমাদের এ বাড়ির এই বড় কত্তার বেলায় ? বল শুনি—কী বলবে ? বোকা সর্দার ব্যাটবল ? তা—তোমার যা শার্প ব্রেন তুমি বটব্যালকে ব্যাটবল বানাতে পারো।"

শুনে রিংকু হাসি চাপতে ঝপ করে এক পাক খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

আর ফটিক? যতক্ষণ না গোবিন্দগোপাল বাথরুমের মধ্যে ঢুকে গেলেন, ফটিক ততক্ষণ হেঁটমুণ্ডে নতচক্ষে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে থাকল।

সেই অবধি ফটিক ভয়ে আর পিসেমশাইয়ের সামনে বেরোয়নি, কাঁটা হয়ে আছে. কখন বড়দাদুর সামনে ওই 'গোবরগণেশ' প্রসঙ্গটা ওঠে। উঠবেই। খাবার টেবিলেই উঠবে। যত গালগল্প তো ওই সময়েই হয়। আর ফটিকের ওপর যত গালমন্দও। বসেছেনও তো সবাই একসঙ্গে। অবশ্য রিংকুর মা বাদে, তিনি তো খাওয়াবেন।

তবুও—তদারক করতে দেয়ালের ধারে সিংহবাহিনী বসে আছেন চেয়ারবাহিনী হয়ে ! সেই চাকাদার চেয়ারটিতে। ফটিক চালিয়ে-চালিয়ে নিয়ে এসেছে। খাওয়ার তদারক করবেন না ? জামাই বলে কথা।

ফটিক ওই চেয়ারটি বসিয়ে রেখে সরে পড়েছে।

অবশ্য একেবারে সরে পড়তে সাহস হয়নি, বজ্রাঙ্গ যদি হঠাৎ ডাক দেন। ফটিক আছে একটা দরজার আড়ালে, যাকে বলে আত্মগোপন করে।

কিন্তু আর সেই 'গোবরগণেশ' প্রসঙ্গ ওঠার ভয় নেই ফটিকের। ফটিক হাঁ করে পিসেমশাইয়ের হাঁ খোলা আর হাঁ বন্ধ দেখছে। দেখছে তো দেখছে। দেখছে তো দেখছে। ওই একই দৃশ্য দেখছে রিংকুও।

রিংকুকে শাসানো হয়েছে পিসেমশাই খেয়ে ওঠার আগে যেন দুম করে না টেবিল থেকে উঠে পড়ে। সেটা ম্যানার্স নয়। বাড়িতে যা করো করো. আজ নয়। পিসেমশাই ম্যানার্স ভালবাসেন।

কিন্তু এই কি ম্যানার্স ?

রিংকুর হাতে লেগে থাকা ফ্রায়েড রাইস বাগানের হাওয়ায় শুকোতে শুকোতে কাঁকর বালির মতো হয়ে উঠছে, রিংকুর চোখ স্থির। ও অবাক হয়ে দেখছে, শুধু দেখছে—কেমন সুকৌশলে আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে জিভ চালিয়ে চালিয়ে হাতটাকে প্রায় সাবান দিয়ে ধোওয়ার মতো সাফ করে ফেলছেন পিসেমশাই।... তার সঙ্গে অবশ্য গল্পও চালাচ্ছেন. ওঁর সেই নেপালে না ভূপালে যে লোকটা রান্নাটান্না করে তার কথা। সে নাকি রান্নার সবই জানে, শুধু জানে না রান্না করতে একটু সময় লাগে। তাই যত ইচ্ছে তেল ঘি মশলা-টশলা খরচা করে গোবিন্দগোপালের সামনে যা ধরে দেয়, তা হচ্ছে— আধসেদ্ধ মাংস, শুকনো চাল, ঢিলের

বড় হয়ে ওঠার খুসীতে এই মেয়েটির মন ভরপুর। আপনার কন্যা ও পুত্র এই মেয়েটির মতোই নিশ্চিত যে তাদের ভবিষ্যতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা, বিবাহ সব-কিছুরই সুব্যবস্থা আপনিই করবেন। সানন্দে এই দায়িত্ব পালন করতে এখন থেকেই আপনি উন্মুখ। তাই না?

আপনার পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ সুখী ও নিশ্চিত করতে আমাদের যে-কোন সঞ্চয় প্রকল্প থেকে আপনার সঞ্চয়ের আয় অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলতে পারেন।

ছোটরা সবাই এসো আমাদের রিচি রোড ও গড়িয়া শাখায় তোমাদের

চিলড্রেন্‌স কাউন্টার-এ

- নিজের নামে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলো, পাশবই নাও।
- নিজের নামে টাকা জমা দাও, নিজের সইতে টাকা তোলো।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ৭, রেড ক্রশ প্লেস, কলিকাতা-৭০০ ০০১
হেড অফিস ঃ ১৭, আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১
চেয়ারম্যান ঃ জে এন বিশ্বাস

Progressive/UIB-/78

মতো আলু, বাগান থেকে তুলে নিয়ে আসার মতো টাটকা কাঁচা আনাজ।

ইশ, গোবিন্দ-গিন্নি যদি বড় চাকরি না করতেন।

তাহলে তো গিন্নির রান্নাই খেতে পেতেন গোবিন্দ। কিন্তু রিংকুর পিসি বড় অফিসার।

শুনতে শুনতে রিংকুর মা "আহা আহা" করে বারবার ও'র পাতে চিংড়ির কালিয়া, মাংসের কোর্মা, ভেটকির ফ্রাই, আর পটলের দোলমা চাপিয়ে চলছিলেন।

আহা! ইশ! রিংকুর মনটা কেমন করে উঠল। নিশ্চয় মা'র নিজের জন্যে ওইসব ভাল-ভালগুলোর কিছু থাকবে না। রিংকু নিশ্বাস ফেলল। মায়ের ওপর রাগও হল রিংকুর। এত কী আদর! পিসিমা এলেও বা কথা ছিল, সত্যিকার নিজের লোক, বাড়ির মেয়ে। আর ইনি তো—

কিন্তু আর কতক্ষণ বসে থাকবে রিংকু? ম্যানার্সের যত দায় শুধু রিংকুরই? পিসেমশাইয়ের হাত চাটা দেখতে-দেখতে রিংকুর মনটাই চটচটে হয়ে যাচ্ছে, তবু ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছিল বেচারা, শেষরক্ষা হল না। বলে না উঠে পারল না, "হাত ধোবেন না পিসেমশাই?"

পিসেমশাই ছাঁটা গোঁফের ফাঁকে একটু হেসে বলেন, "হবে বাবা, হবে। হাত ধোওয়া তো পালিয়ে যাচ্ছে না। তোর মায়ের হাতের এই বাগদা চিংড়ির কালিয়ার সুবাসটুকু কি আর সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলবার জিনিস রে? যতক্ষণ পারা যায়—"

"বাগদা নয়," রিংকুর বাবা ভুল সংশোধন করে দেন, "বাগদা নয় জামাইবাবু, গলদা।"

গলদা!

লজ্জিত হন না গোবিন্দগোপাল। তেমনি হেসে হেসে বলেন, "ও একই কথা। আহা কতদিন যে এমন হাতি-চিংড়ি চোখে দেখিনি। গলদা বাগদার তফাতই ভুলে গেছি।"

এরপর লোকে কোন লজ্জায় আরও একবার ওই নাম-ভুলে-যাওয়া জিনিসটা না দেবে? দেওয়া হল। কাজেই আরও একবার আঙুল সাফের প্রশ্ন। তার মানে নতুন করে ধৈর্যের পরীক্ষা! শেষ অবধি কিন্তু বজ্রাঙ্গ বটব্যালই বলে ফেললেন, "কী হে গোবিন্দগোপাল, তুমি যে আঁচাতে উঠছই না?"

রিংকুর পৃষ্ঠবল বাড়ে, রিংকু ফশ করে বলে বসে, "আঁচাবার আর দরকার কী বড়দাদু? চেটে-চেটে তো সাফই হয়ে গেছে।"

চেটে-চেটে!

গোবিন্দগোপাল চমকে ওঠেন, নিজের হাতের দিকে তাকান। তাই তো, মনে হচ্ছে বটে যেন সাবান দিয়ে ধুয়ে এসেছেন। তবু গোবিন্দগোপাল চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়বার সময় বলে ওঠেন, "ছেলেটি তো তোমার ভারী ডেঁপো হয়েছে হে গোরা।"

কিন্তু সে তো চেয়ার ছেড়ে উঠে আসবার সময়।

তারপর?

মানে ঠিক তার পরক্ষণেই!

হ্যাঁ, ঠিক তার পরক্ষণেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন গোবিন্দগোপাল। বেসিনের কাছে গিয়েই—"ও কী? ওটা কী? এ বাড়িতে ও কী করে—এএ—।" বলেই ভয়ঙ্কর এক আর্তনাদ করে হুড়মুড়িয়ে পিছু লাফ খেয়ে আবার চেয়ারে বসে পড়তে এসে টেবিলে ধাক্কা মেরে কাঁচের বাসন ভেঙে চেয়ার উল্টে ফেলে মাটিতে বসে পড়লেন।

হ্যাঁ, মাটিতেই বসে পড়লেন আসল জাপানি টেরিকটের প্যান্ট পরে।

(ক্রমশ)

ছবি সুধীর মৈত্র

বটিকা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

গরুদের জোড়া শিং
ঘোড়াদের নেই,
কেন, কেউ জানে তার অর্থ ?
হিমালয় কেন উঁচু,
সাহারায় শুধু বালি
সমুদ্রগুলো কেন গর্ত ?

পরীক্ষা-দেওয়া খাতা
কেন গিয়ে হারিয়ে
ঠোঙা হয় মুদিদের দোকানে ?
টেলিফোন-যন্ত্রটা
যায় ঠিক বোবা হয়ে
যখন জরুরি কথা যেখানে।

কেন পাখা থেমে যায়
গরমের দুপুরেই
আঁধার হলেই বাতি নিভে যায় ?
বাস্ লরি জো পেলেই
কেন করে কোলাকুলি ?
সান্তালদি কেন বেগড়ায় ?

এ-সব জানতে হলে
'সাইক্লোপিডিয়া' নয়
'অজ্ঞতা-বিনাশিনী' কেনো,
বই-টই কিছু নয়
হজমিগুলির মতো
আজব বটিকা এক জেনো।

সে বড়ির এত গুণ
মুখে দিতে-না-দিতেই
এক ছুটে চলে যায় মগজে,
তারপর কী যে হয়,
তোড়ে বাণী বার হয়
কলমটা ছোঁয়ালেই কাগজে।

ছবি বিমল দাশ

শিশুদের– কিশোরদের–যত ছোটদের বই

শিবরাম চক্রবর্তী
হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন ৪·০০
শিব্রামের বারো আড়ি ৫·০০
দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৫·০০
এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী ৬·০০
বিমল কর
ওআন্ডার মামা ৬·০০
কাপালিকরা এখনও আছে ৭·০৩
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরী
নিশীত রাতের আহ্বান ৩·০০
গৌরকিশোর ঘোষ
দুষ্টুর দুপুর ৩·০৩
আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫·০০
পার্থসারথি চক্রবর্তী
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪·০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪·০০
রসায়নের ভেল্‌কি ৩·০০
ম্যাজিকের মত মজা ৫·০০
মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭·০০
শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩·০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪·০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬·০০
বাজনা ৫·০০
হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫·০০
আমার নাম টায়রা ৫·০০
বুদ্ধদেব গুহ
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫·০০
মউলির রাত ৫·০০
সুকুমার রায়
সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০·০০
জীবজন্তু ৮·০০
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২·০০
সরলাবালা সরকার
পিন্‌কুর ডাইরি ৩·০০
মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬·০০
শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র
আগ্রা যখন টলমল ৫·০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৫·০০
পাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫·০০
পাপুর বই ৬·০০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ের মুখোশ ৫·০০
পাথরের চোখ ৬·০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬·০০
পাঁচমুণ্ডীর আসর ৬·০০
ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫·০০
শরৎ কথামালা ১০·০০

সত্যজিৎ রায়

দুটি আশ্চর্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে সব-বয়সের পাঠককে কাছে টেনে নিয়েছেন। একটি হল গোয়েন্দা ফেলুদা, অন্যটি প্রোফেসার শঙ্কু। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হল, এ-দুটি চরিত্রের যে-কোনও কাহিনী সমানভাবে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে, অথচ দুটি চরিত্রের মধ্যে কোনো মিল নেই। একজন দুর্ধর্ষ রহস্য-সন্ধানী, অন্যজন নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিক। অথচ দু-জনেরই নিত্য নতুন কাণ্ডকারখানা পড়বার জন্য সব্বাই একেবারে উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

সত্যজিৎ রায়ের বই

মহাসংকটে শঙ্কু ৬.০০ ফেলুদা এণ্ড কোং ৮.০০ ফটিকচাঁদ ৮.০০ জয় বাবা ফেলুনাথ ৬.০০ আরো এক-ডজন ১০.০০ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫.০০ সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬.০০ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫.০০ বাক্স-রহস্য ৫.০০ সোনার কেল্লা ৬.০০ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫.০০ প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫.০০ এক ডজন গপ্‌পো ১০.০০ বাদশাহী আংটি ৫.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪·০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৫·০০
সত্যি রাজপুত্র ৫·০০
তিন নম্বর চোখ ৫·০০
হলদে বাড়ির রহস্য ও
দিনে ডাকাতি ৬·০০
সবুজদ্বীপের রাজা ৫·০০
মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪·০০
স্ট্রাইকার ৬·০০
স্টপার ১০·০০
কোনি ৬·০০
সমরজিৎ কর
একটি সংকেতের জন্যে ৬·০০
নারায়ণ চক্রবর্তী
হলদে সবুজ কৃস্টাল ১০·০০
পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪·০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪·০০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার শেলক ৪·০০
লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪·০০
অমরনাথ রায়
দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ১০·০০
আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪·০০
সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫·০০
অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩·০০
ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ী ৪·০০
যাদুঘরে চল যাই ৬·০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৫·০০
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬·০০
সমগ্র কিশোরসাহিত্য (প্রথম খণ্ড) ২০·০০
গিরিধারী কুণ্ড
টংসা চু ৫·০০
সুবোধ ঘোষ
সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৫·০০
বিমল মিত্র
রাজা হওয়ার ঝকমারি ৬·০০
শিশিরকুমার মজুমদার
তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫·০০
অন্নদাশংকর রায়
হৈ রে বাবুই হৈ ৫·০০
মঞ্জিল সেন
ডাকাবুকো ৫·০০
রেবন্ত গোস্বামী
অরুমিতুদের কথা ৪·০০
শিশির কর
গঙ্গায় বাঘ ৪·০০
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬·০০

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ১৩ ॥

উনিশশো ছাপ্পান্নোর মেলবোর্ন অলিম্পিক দল থেকে আমি বাদ পড়লুম। কেন আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল? কিছু রহস্য অবশ্যই আছে। কিন্তু আজ আর আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি চিরদিন ভগবানে বিশ্বাসী এবং বিশ্বাস করি, ফুটবল খেলার ব্যাপারে ঈশ্বর আমার কোনো সাধ অপূর্ণ রাখেননি। তবু বৃহত্তর পরিবেশে আমার খেলোয়াড়-জীবন বিকাশের মুখে বড় আশার রঙিন বেলুনটা কীভাবে চুপসে গিয়েছিল—সে সম্পর্কে দু-চার কথা বলার হয়তো প্রয়োজন আছে।

মেলবোর্ন অলিম্পিক দলে কারা ছিলেন দেখা যাক: পি থঙ্গরাজ (সার্ভিসেস), এস নারায়ণ (বোম্বাই), এ টি রহমান (বাংলা), এস আজিজুদ্দিন (হায়দরাবাদ), লতিফ (হায়দরাবাদ) কেম্পিয়া (বাংলা), এ সালাম (বাংলা), নিখিল নন্দী (বাংলা) আমেদ হোসেন (হায়দরাবাদ), নূর মহম্মদ (হায়দরাবাদ), পি কে ব্যানার্জি (বাংলা), বদরু ব্যানার্জি—অধিনায়ক (বাংলা), কে পাল (বাংলা), জে কিটু (বাংলা), কানাইয়ান (বাংলা), নেভিল ডি'সুজা (বোম্বাই), মহম্মদ জুলফিকার (হায়দরাবাদ) ও টি বলরাম (হায়দরাবাদ)।

কারও যোগ্যতা সম্পর্কে আমি প্রশ্ন তুলছি না, যদিও তখন অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন—"চুনীকে উপেক্ষা না করে কানাইয়ান, জুলফিকার অথবা বদরু ব্যানার্জির মধ্যে একজনকে কি বাদ দেওয়া যেত না?"

এই তিনজনের কেউ কি আগে ভারত দলে খেলেছেন কিংবা পরে? না, কেউ খেলেননি। কানাইয়ান আবার ক্যাম্প শেষ হওয়ার সাত দিন আগেই তলপি-তলপা গুটিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। কানাইয়ান খেলতেন রাজস্থান ক্লাবে। কেন তাঁকে দলে নেওয়া হয়েছিল, দল গড়া নিয়ে কোচ রহিম সাহেবের সঙ্গে কী চুক্তি হয়েছিল, কীভাবে হায়দরাবাদের একজনকে দলভুক্ত করার জন্য বাংলার একজনকে উপেক্ষা করা হয়েছিল, আমার সিনিয়র বন্ধু এবং বাংলার বদরু ব্যানার্জিকে অধিনায়ক করতে কী খেসারত দিতে হয়েছিল—সে সব অনেকের কানে কটু লাগতে পারে। অপ্রিয় কথা বেশি না বলাই ভাল। তখন সব কথা জানার বা বোঝার সুযোগও ছিল না আমার। পরে অনেক কথাই জেনেছি। তখন শুধু শুনেছিলাম, আগের দুটি অলিম্পিকে দুজনই বাংলার এবং দুজনই মোহনবাগানের খেলোয়াড় অধিনায়ক হয়েছিলেন বলে পরোক্ষ একটা চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল—কেন বাংলার এবং মোহনবাগানের খেলোয়াড় আবার অধিনায়ক হবেন? আটচল্লিশে লন্ডন অলিম্পিকে অধিনায়ক হয়েছিলেন টি আও, বাহান্নয় হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে মান্নাদা। আর শুনেছিলাম সমালোচনার উত্তরে তখন ফুটবল প্রশাসনের হর্তা-কর্তা এম দত্তরায় বলেছিলেন, "ওঃ, চুনী? ওর তো বয়স সবে আঠারো বছর। এত ব্যস্ত কেন? ভাল খেলছে, খেলুক। জীবনে প্রচুর খেলার সুযোগ পাবে।"

পেয়েছি। সত্যিই প্রচুর ভাল ম্যাচ খেলেছি। আগেই বলেছি ঈশ্বর তাঁর আশীর্বাদ থেকে আমাকে বঞ্চিত করেননি। কিন্তু তার জন্য আমাকে প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়েছে নিজের উপর পুরোপুরি বিশ্বাস বজায় রেখে। আমার মোহনবাগান ক্লাবও আমাকে অঢেল সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু তোমরাই ভেবে দেখ, যদি ছোট ক্লাবের কোনও খেলোয়াড় বড় হয়ে উঠবার মুখে এভাবে উপেক্ষিত হতেন, কিংবা মনের উপর প্রচণ্ড আঘাত পেতেন তাহলে কি তার পক্ষে সহজে মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভব হত?

যাই হোক, বিবেকের তাড়নায় হোক কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক, মেলবোর্ন অলিম্পিক থেকে দলটি ফিরে আসার পর মাস দেড়েকের মধ্যে দূরপ্রাচ্য সফরের জন্য ওই গোটা অলিম্পিক দলের সঙ্গে আমার নামটিও জুড়ে দেওয়া হল। আমি কিন্তু ভারত দলের হয়ে প্রথম বিদেশ সফরের সুযোগ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলুম। কোনো অভিমানে বা কারও উপর রাগ করে নয়। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে খেলার নৈতিক কর্তব্যবোধে। আমিই বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলুম। আশুতোষ কলেজে ওই বছরই ছিল আমার শেষ বছর, যদিও ল কলেজে পড়ার সময়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছি বিভিন্ন খেলায়। বিশ্ববিদ্যালয় দলে খেলার জন্য ভারতীয় দলের সঙ্গে বিদেশ সফরে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনেকেই বেশ অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু খুশি হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের তদানীন্তন সম্পাদক ডি কে চৌধুরী ও অধ্যাপক শান্তিময় রায়। অধ্যাপক রায় গিয়েছিলেন বেরিলি ও তিরুপতিতে বিশ্ববিদ্যালয় দলের ম্যানেজার হয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় দলেই খেলব—এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কয়েকটি চিন্তা আমার মাথায় এসেছিল। ভেবেছিলুম, অলিম্পিকেই যখন যেতে পারলুম না তখন দূরপ্রাচ্য সফরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হব কেন? এম দত্তরায়ের কথাটিই মনে এসেছিল—খেলতে যদি পারি এমন সফর জীবনে অনেক আসবে। দ্বিতীয় চিন্তা ছিল, ফুটবলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নিয়ে। খেলাধুলোয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত ইতিহাস গর্ব করার মতো। সাধে কি আর কেউ-কেউ আজও গর্ব করে বলেন—"আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু"।

সত্যিই, আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে খেলার একটা পৃথক গৌরব ছিল। সেই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৩ সালের পর আর স্যার আশুতোষ শীল্ড জিততে পারেনি। তখন আমাকেই করা হয়েছিল অধিনায়ক। সুতরাং ভাবলুম, ফুটবলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্ধারে সর্বশক্তি নিয়োগ করা আমার নৈতিক কর্তব্য।

কিন্তু, দায়িত্ব ঘাড়ে চাপার পর পড়লুম মহা মুশকিলে। বিশ্ববিদ্যালয় দলে যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের অনেকের খেলার সঙ্গেই পরিচিত ছিলুম না। চিনতুমও না অনেককে। ক্লাবের খেলার জন্য আন্তঃকলেজ ফুটবলের অনেক ম্যাচেই তো খেলতে পারিনি। আমাদের আশুতোষ কলেজের আরও দুজন দলে ছিলেন—চন্দন ব্যানার্জি ও রঞ্জিত ব্যানার্জি। চন্দন আমার সহপাঠী। পরে হাফ ব্যাকে যথেষ্ট নাম করেছিল। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্যাপ্টেন হয়েছিল। রঞ্জিত নাম করেছিল খিদিরপুর ক্লাবে খেলে। চন্দনকে জিজ্ঞাসা করলুম, "হ্যাঁ রে চন্দন, অনেকের খেলাই তো আমি দেখিনি। কে কেমন খেলে রে? ডিফেন্স নিয়েই আমার ভয়।"

চন্দন বলল, "গোলে অবনী বসু ভালই খেলে। আর শিবপুর দীনবন্ধু কলেজের একটি পাতলামতো ছেলে দলে আছে। নাম এ ঘোষ। ব্যাকে মোটামুটি মন্দ খেলে না।"

তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এত বেশি ছিল না। এতগুলি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল দল, ১৯৫৭। পিছনের সারিতে, বাঁ দিক থেকে তৃতীয়জন চুনী গোস্বামী সামনের সারিতে, একেবারে ডাইনে নাটকী সোম।

জোনেও খেলা হত না। খেলা হত দুটি জোনে। উত্তর ও পশ্চিম। উত্তরাঞ্চলের খেলা হত একটি কেন্দ্রে, পশ্চিমাঞ্চলের আর এক কেন্দ্রে। দুই কেন্দ্রের বিজয়ীর মধ্যে হত স্যার আশুতোষ ট্রফির ফাইনাল খেলা। ওই বছর উত্তরাঞ্চলের খেলা হয়েছিল বেরিলিতে, ফাইনাল তিরুপতিতে। আমি উনিশশো সাতান্নর আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের কথাই লিখছি।

বেরিলি যাত্রার আগে আই এফ এ বাছাই একাদশের সঙ্গে আমাদের দলের এক প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা হল। সালাম, নিখিল নন্দী, পি কে ব্যানার্জি এবং মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের নামী খেলোয়াড়েরা ছিলেন আই এফ এ দলে। ওই শক্তিশালী দলকে আমরা ২—০ গোলে হারিয়ে যাত্রার আগে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম। অনুপ্রেরণাও পেয়েছিলুম। কিন্তু শুধু সেজন্য নয়, কিংবা দুটি গোলই আমি করেছিলুম বলেও নয়, আমি ভীষণ খুশি হয়েছিলুম দীনবন্ধু কলেজের শ্যামবর্ণের সেই পাতলা ছেলেটির খেলা দেখে। খেলার মধ্যেই চন্দনকে কনুই দিয়ে ছোট্ট একটু গুঁতো মেরে বলেছিলুম, "তুই না বলে ছিলি, মন্দ খেলে না, এ যে দেখছি দারুণ খেলে রে। এই তোর মোটামুটি খেলা? দেখছিস না, কী সহজ ভঙ্গিতে আই এফ এ-র আক্রমণ রুখে দিচ্ছে। পেছনের জন্য আর আমার চিন্তা নেই।"

এ ঘোষকে সেই আমি প্রথম চিনলুম। তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরে নিতে পেরেছ, এ কোন্ এ ঘোষ। হ্যাঁ, পরবর্তী কালের দুর্দান্ত বাক ও স্টপার এবং এখনকার কোচ অরুণ ঘোষই সেই এ ঘোষ।

খেলতে খেলতে ওই বছরের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলেই আমি ফুটবল মাঠের আর-এক সিংহের সামনে পড়েছিলুম এবং সিংহটিকে ভাল করে চিনে রেখেছিলাম। পরে লিখছি সে-কথা। তার আগে আমার গোল করার কথা বলে নিই।

আমি কোনদিনই দাবি করি না যে, আমি বড় স্কোরার ছিলুম। যদি বড় স্কোরার হতুম তবে দশ-এগারো মরশুমের অন্তত এক মরশুমে গোলদাতার তালিকায় সবার ওপরে নাম থাকত। এই যে গত মাসে মেওয়াদার কথা লিখেছি, কলকাতার লীগে তিনি চারবার হাইয়েস্ট গোল-গেটার হয়েছেন। আমি একবারও হতে পারিনি। এখন না হয় খেলার ধারা বদলে গেছে। একজন সেন্টার ফরোয়ার্ডের বদলে বেশি গোল করছে দুজন স্ট্রাইকার। আগে সেন্টার ফরোয়ার্ডরাই বেশি গোল করতেন। ইনের খেলোয়াড়রা তাকে সাহায্য করতেন, আক্রমণ তৈরি করে দিতেন। মুখ্যত ইনম্যানরা হতেন দলের স্কোরার। আমার ভূমিকাও তাই ছিল। আমার আদর্শ ইনম্যান আমেদ খাঁর মধ্যেও গোলের ক্ষুধা দেখিনি। তাঁর মতোই আমার বিশ্বাস ছিল, যদি বল কন্ট্রোল থাকে আর পায়ে থাকে ড্রিব্ল করার কৌশল ও শট, তবে গোল পাবই। পেয়েছিও, যেমন পেয়েছেন বিখ্যাত খেলোয়াড় বলরামও। তবে গোল করার ব্যাপারে এই আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় আমি সব চেয়ে সফল হয়েছিলুম। প্রথম রাউন্ড থেকে ফাইনাল পর্যন্ত প্রতি খেলায় গোল করেছিলাম। তার আগে আই এফ এ একাদশের বিরুদ্ধে দুটি গোলের কথা তো আগেই লিখেছি। আজ বিশেষ করে মনে পড়ছে বেরিলিতে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিরুদ্ধে আমার ডাবল হ্যাট্রিক করার কথা। আমাদের সময় ক্রিকেট এবং ফুটবলে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ নাম ছিল। আমরা কিন্তু ওদের হারিয়েছিলুম ৭—০ গোলে। আমি পরপর ছয়টি গোল করার পর পেনাল্টি পেয়ে আর একটি গোল করতে যাচ্ছিলুম। আমাকে কিক নিতে দিল না আমার বন্ধু নাটকী, ভারতের ফুটবল

কাননে পূর্ণদলে ফুটে ওঠার আগেই সে অনেককে কাঁদিয়ে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছে। ভালনাম ছিল অসীম সোম। অতীতের বিখ্যাত খেলোয়াড় বাঘাদার কনিষ্ঠ পুত্র। অসাধারণ প্রতিশ্রুতিমান খেলোয়াড় ছিল। জন্মেছিল ফুটবলারের ঘরে। ফুটবলের আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছিল। চমৎকার ছিল স্বাস্থ্যের বাঁধুনি। শিক্ষা পেয়েছিল বাবার কাছে। কিন্তু এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় অকালেই চলে গেল। আলিগড়ের বিরুদ্ধে সপ্তম গোলটি নাটকীই করেছিল। অন্য খেলাগুলির কথা আজ আর ভাল করে মনে নেই। রেকর্ডও রাখিনি।

বেরিলিতে উত্তরাঞ্চলের ফাইনাল খেলা ছিল পাঞ্জাব বিশ্ব বিদ্যালয়ের সঙ্গে। পাঞ্জাবি খেলোয়াড়রা সুদেহী। তখনই ওঁরা তিন ব্যাক পদ্ধতিতে খেলা শুরু করেছিলেন। আমরা খেলেছি দুই ব্যাক প্রথায়। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে খেলা চলতে লাগল। অবশ্য আক্রমণে আমাদেরই ছিল সিংহ ভাগ। কিন্তু সেই যে সিংহের কথা আগে লিখেছি, কিছুতেই তাকে অতিক্রম করে গোলে শট নেওয়ার সুযোগ পেলাম না। কেশর ফুলিয়ে খেলে আমাদের সব আক্রমণ রুখে দিতে আরম্ভ করল। ওদের তিন ব্যাকের ডিফেন্স, বিশেষ করে স্টপারের বিক্রমে কিছুতেই ফাটল সৃষ্টি করতে পারছি না দেখে চন্দনের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে বললাম, "তোরা নিচু দিয়ে বল না বাড়িয়ে গোলের মুখে বল লব করে দেখি। মনে হচ্ছে, হেডওয়ার্কে ওরা তেমন পোক্ত নয়।"

তাতেই কাজ হল। শেষ পর্যন্ত চন্দনের লব করা বলে হেড করে আমি জয়সূচক গোলটি পেলাম। হেড করে আমি গোল করেছি কালেভদ্রে। তার মধ্যে ওই গুরুত্বপূর্ণ খেলায় একটি।

রাত্রে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় দলের কয়েকজন খেলোয়াড়কে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ক্যাম্পে এলেন ওই বিশ্ববিদ্যালয় দলের ফুটবল কোচ প্রকাশ সিং। প্রকাশ সিংকে আমরা ভালভাবে চিনতুম। রাজস্থান ক্লাবে খেলে গেছেন। তাঁর খেলোয়াড়রা কেমন খেলছে সে সম্পর্কে আমাদের মত মত জানতে চাইলেন। তারপর দু-তিনজন খেলোয়াড়কে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কলকাতার কোনো ভাল ক্লাবে তাদের খেলার সম্ভাবনা আছে কিনা। বলা বাহুল্য তার মধ্যে সেই সিংহটি ছিল। আমরা নাম জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, "জারনেল সিং।" এখন বুঝতে পারছ তো, কোন্ সিংহের মুখে আমরা পড়েছিলুম সেদিন। জারনেল পরে কলকাতায় চলে আসেন এবং কত বড় খেলোয়াড় হন, সবাই জানো সে-কথা।

এবার আমরা ফাইনাল খেলতে যাব তিরুপতিতে, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। উত্তরাঞ্চল ফাইনালে জেতার পর আমরা বেশ খোশ মেজাজে ছিলুম। নাটকী বলল, "জানিস এখানে গরম কাপড় বেশ শস্তা। প্যান্টের মজুরি মাত্র পাঁচ টাকা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ডেলিভারি দেয়। চল্, দুটো প্যান্ট তৈরি করে নিয়ে যাই।"

নাটকী ছিল খুব শৌখিন প্রকৃতির। সাজ পোশাকের উপর খুব নজর ছিল। সব সময় ছিমছাম ফিটফাট হয়ে থাকত। জামা প্যান্টের ভাঁজ নষ্ট হবে বলে ভিড় এড়িয়ে চলত। কিন্তু হায়, ওই এড়িয়ে চলার অভ্যাসই ওর মৃত্যুর কারণ হল কি না কে জানে।

লিলুয়া থেকে ট্রেনে কলকাতায় আসার সময় ও ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সেখান থেকে পড়ে গিয়েই হোক কিংবা পোস্টের সঙ্গে ধাক্কা লেগেই হোক, ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আর তাতেই শেষ হয়ে গেল একটি ফুটন্ত জীবন। অনেকের ধারণা, জামা প্যান্টের ভাঁজ নষ্ট হওয়ার ভয়ে নাটকী

অরুণ ঘোষ জারনেল সিং

ভিড়ের মধ্যে না বসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

বেরিলিতে আমি ও নাটকী দুটি উরস্টেড ফ্লানেলের প্যান্ট তৈরি করিয়েছিলুম। কিন্তু সে প্যান্ট আর পরা হয়নি। তেমনি ইস্ত্রি করা ভাঁজ করা অবস্থায় স্মৃতি-সামগ্রীর সঙ্গে সযত্নে রেখে দিয়েছি। বর্ষায় পোকায় কাটার ভয়ে অন্য সব গরম জামা-কাপড়ের সঙ্গে সেদিনে রোদে দেওয়া হয়েছিল। দেখেই নাটকীর কথা মনে পড়ে গেল। একটা বোবা ব্যথায় কেমন যেন আনমনা হয়ে উঠলুম। কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখ। যখন এই লেখাটা তৈরি করার কথা ভাবছি তখনই চোখে পড়ল ওই উরস্টেড ফ্লানেলের ট্রাউজারটি। আস্তে আস্তে ঘরে এসে ছবির অ্যালবাম খুলে বসলাম। দেখলাম, আমাদের গ্রুপ ফোটোর মধ্যে বসে নাটকী এখনো হাসছে।

বেরিলি থেকে আমরা তিরুপতিতে ফাইনাল খেলতে গিয়েছিলুম দিল্লি হয়ে। সময় বেশি হাতে ছিল না। রেলের রিজার্ভেশন পাওয়া শক্ত ছিল। ওই সময় আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত ছিলেন দিল্লিতে। দলের ম্যানেজার অধ্যাপক শান্তিময় রায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি একদিনের মধ্যে রেলের একটি ছোট কামরা রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করে দিলেন। ভাইস-চ্যান্সেলার খেলাধুলো খুবই ভালবাসতেন। আমাদের খেলার কথা শুনে খুশিও হলেন খুব। অল্প সময়ের মধ্যে হুমায়ুন কবির আমাদের ছোট এক টি-পার্টিতে আপ্যায়িত করলেন। তিনিও খেলা ভালবাসতেন। তাছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই তো অধ্যাপক ছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের আপন করে নিয়ে বললেন, "আশাতেষ ট্রফি নিয়ে ফেরা চাই।"

তিরুপতি দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। দক্ষিণাঞ্চলে ফুটবলও ভীষণ জনপ্রিয় খেলা। বড় তীর্থক্ষেত্র বলেই সেখানে ওই সময়ে অত ভিড় হয়েছিল, না কি তার সঙ্গে ফুটবলেরও আকর্ষণ ছিল, ঠিক বলতে পারব না। তবে আমরা পৌঁছবার পরে ওখানে বেশ শোরগোল পড়ে গেল। অনেকেই আমাদের দেখতে এলেন। মনে হল, আমাকে নিয়ে তাঁদের মধ্যে যেন বেশি কানাকানি। হঠাৎ অতিবৃদ্ধ এক ভদ্রলোক উপস্থিত হলেন আমাদের ক্যাম্পে। তাঁর হাতে একটি ফুলের মালা ও একটি পত্রিকা। বৃদ্ধ লোকটি তামিল ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেন

না। সেই ভাষাতেই কথা বলতে আরম্ভ করলেন। গোস্বেয়ামী গোছের একটা শব্দের আঁচ পেয়ে অরুণ বুঝে নিল যে, বৃদ্ধ লোকটি আমাকে খুঁজছেন। এমনিতে অরুণ চিরদিন ভীষণ লাজুক প্রকৃতির। তখন মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি চাপল একটু মস্করা করার। ইংরেজিতে বলল, "আমিই চুনী গোস্বামী।"

বৃদ্ধ লোকটি পত্রিকাটির ছবির সঙ্গে অরুণের চেহারার মিল খুঁজে না পেয়ে মাথা নাড়তে আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে আমি তাঁর কাছে এগোতেই লাফিয়ে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরে হাতের মালাটি গলায় পরিয়ে দিলেন।

ব্যাপারটা কী হয়েছিল জানো ? তখনকার নাম-করা ক্রীড়া-পত্রিকা স্পোর্টস অ্যান্ড প্যাস্টাইমের কভার পেজে ওই সপ্তাহের সংখ্যাতেই ক্রীড়াভঙ্গিতে আমার বড় এক ছবি ছাপা হয়েছিল। বৃদ্ধলোকটি সেই পত্রিকাটি সঙ্গে করে এনেছিলেন আমার চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য। এই সব ছোট-ছোট ঘটনা কখনোই বোধহয় ভুলতে পারব না।

ভুলতে পারিনি মহাতীর্থের আর এক দৃশ্য। তীর্থ-যাত্রীদের অনেকেই ক্ষৌরকার দিয়ে মাথার চুল কামিয়ে তিরুপতির মন্দিরে পুজো দেন। আমরা দেখলুম, এক-একজন ক্ষৌরকারের চারদিক ঘিরে বসে আছেন অনেক পুণ্যার্থী। কারও মাথা অর্ধখানা কামানো, কারও মাথার সিকিভাগ কামানো, কারও বা কামানো বারো আনা। সত্যিই সে এক মজার দৃশ্য। অসংখ্য পুণ্যার্থী, ক্ষৌরকারের সংখ্যাও বিশাল। খদ্দের যাতে হাতছাড়া না হয় তার জন্যই ক্ষৌরকাররা কারও মাথা আধখানা কামিয়ে, কারও সিকি কামিয়ে, কারও মাথায় ক্ষুরের দুই একটি টান দিয়ে পাশে বসিয়ে রেখেছে। তারপর তাগিদ বুঝে পুরো মাথা কামিয়ে দিয়ে, পয়সা বুঝে নিয়ে ছেড়ে দেয়। এক একজন ক্ষৌরকারের পাশে চুলের পাহাড় জমে যায়। এই চুল বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা আয় হয়।

এই যে মাথা মুড়িয়ে পুজো দেওয়া, একে সংস্কারই বলো আর কুসংস্কারই বলো, মানুষ সহজে এটা কাটিয়ে উঠতে পারে না। এ বছর মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের লীগ ম্যাচে দুটি দল যে ৪৫ মিনিট পরে মাঠে নামল, সেও তো সংস্কারের বশে। তিরুপতিতে আমাদের মনেও সংস্কারের ছোঁয়া লাগল, যখন পান্ডা এসে বলল, মাথা মুড়িয়ে বাবার মন্দিরে পুজো দিলে ফাইনালে আমরা জিতবই। প্রথমে আমরা ভাবলুম, তাই করব। উপস্থিত বুদ্ধি ছিল চন্দনের। চন্দন বলল, "দেখ, প্রথমে তো ওই আধমাথা বা সিকিমাথা কামিয়ে বসিয়ে রাখবে। তারপর ফাইনালে যদি জিতি ভাল কথা। কিন্তু যদি হেরে যাই। ন্যাড়া মাথায় খালি হাতে কলকাতায় ফিরলে সবাই বলবে—এত গোল খেয়েছে যে, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে ছেড়ে দিয়েছে। দরকার নেই বাবা। এমনিই তিরুপতিকে মনে মনে পুজো দিচ্ছি। খেলতে যদি পারি জিতবই।"

চন্দনের কথাটা আমাদের মনে ধরল এবং ফাইনাল খেলার দিন তিরুপতির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আমরা মাঠে নামলুম। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দলের সঙ্গে সে কী হাড্ডাহাড্ডি খেলা। একবার ওরা আক্রমণ করে, একবার করি আমরা। শেষ পর্যন্ত আমরা ১—০ গোলে জিতে চার বছর পরে স্যার আশুতোষ স্মৃতি শীল্ড পেলুম। গোলটি আমিই করেছিলুম। আমার অধিনায়কত্বে বিশ্ববিদ্যালয় দলের এই সাফল্যে অলিম্পিকে না যাওয়ার দুঃখ মুছে গেল। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় সত্যিই দারুণ সংগ্রাম করেছিল। জয় কষ্টার্জিত ছিল বলে আনন্দও হয়েছিল বেশি। বোম্বাইয়ের সব খেলোয়াড়ের কথা মনে নেই। কিন্তু দেবদাসের খেলার কথা এখনো মনে আছে। খুবই ভাল খেলে-ছিলেন। পরে আমাদের সঙ্গেই গিয়েছিলেন রোম অলিম্পিকে। তবে ওই ফাইনালে দেবদাস একটি পেনাল্টি কিক থেকে গোল করতে পারেননি। দেবদাস কিক করার জন্য বলটি বসাতেই আমাদের গোলকীপার অবনী বসু, যে পরে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানে খেলেছে, এগিয়ে গিয়ে বলটি উলটে বসিয়ে দিয়ে এল, আর দেবদাসের কিক বারের উপর দিয়ে চলে গেল।

তোমরা একটা কথা জেনে রাখো। পেনাল্টি কিকের সময় ওইভাবে বল উলটে বসানোর কোন অধিকার নেই গোলকীপারের। কিকার তার ইচ্ছেমতো বল বসাতে পারে। আগে যখন লেস আটা বলে খেলা হত তখন প্রায় সব গোলকীপারের ওই অভ্যাস ছিল। এখনো অনেকে এগিয়ে এসে বল উলটে দিয়ে যায়। কেউ করে আর-পাঁচজনের দেখাদেখি। কেউ করে আইন জানে না বলে। কেউ আবার করে দুষ্টু বুদ্ধি নিয়ে। কিকারের মনের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করতে। ১৯৪৮ সালে লন্ডন অলিম্পিকে আমাদের মান্নাদা ও মহাবীর পেনাল্টি কিক থেকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গোল করতে পারেননি। ফরাসি গোলকীপার দুবারই নাকি এগিয়ে এসে বল উলটে বসিয়ে গিয়েছিলেন তার ফলেই মান্নাদা ও মহাবীরের মনের উপর প্রতিক্রিয়া এবং গোল করায় ব্যর্থতা। অবনীর কাজ দেবদাসের ব্যর্থতার কারণও হতে পারে। পেনাল্টি কিক থেকে গোল করা অবশ্য সোজা, কিন্তু ঠিক মতো কিক করার জন্য কলজের যথেষ্ট জোর থাকা দরকার। পেনাল্টি কিক এমন একটি কিক, যা থেকে গোল করলে তেমন গৌরব নেই। গোল করতে না পারলেই অগৌরব। (ক্রমশ)

রজনীবাবুর গল্প

বাণীব্রত চক্রবর্তী

পুজো আসতে আর বেশি দেরি নেই। এবারের পুজোয় রজনীবাবুকে বেশ কয়েকটা ভূতের গল্প লিখতে হল। এখনো একটা গল্প লেখা বাকি। এখন অনেক রাত। রজনীবাবু গল্প লিখতে বসেছেন। ভূতের গল্প।

কালীঘাটের গঙ্গার কাছাকাছি একটা দোতলা বাড়িতে তিনি থাকেন। খুব ছোট্ট বাড়ি। একা মানুষ। বিয়েটিয়ে করেননি। তাঁর কাজের লোকের নাম হরি। হরি সব কাজ করে। রান্নাবান্না, জামাকাপড় কাচা, ঘর পরিষ্কার করা, বাজার করা ইত্যাদি সব কিছু। বাড়িটার একতলায় বসার ঘর আর খাবার ঘর। দোতলায় রজনীবাবু থাকেন। দোতলার ঘরের জানলার ধারে লেখার টেবিল। জানলা দিয়ে গঙ্গা দেখা যায়। গঙ্গার পাড়ে একটা বট গাছ।

কিন্তু রজনীবাবু আজ একটা লাইনও লিখতে পারছেন না। ভূতের গল্পের কোনোরকম প্লট তাঁর মাথায় আসছে না। একের পর এক শুধু সিগারেটই শেষ হচ্ছে। তিনি যখন ষষ্ঠ সিগারেটটি শেষ করলেন তখন ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। কলম রেখে তিনি জানলার দিকে তাকালেন। আর তাকাতেই তিনি দেখতে পেলেন, গঙ্গার পাড়ের বটগাছটির নীচে দাঁড়িয়ে একটা লোক তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। রজনীবাবু অবাক হলেন। কে লোকটা ? তিনি দেখলেন লোকটা বটগাছের তলা ছেড়ে আস্তে আস্তে এইদিকেই আসছে। একেবারে এই ঘরের জানলার ঠিক নীচে এসে লোকটা দাঁড়াল। চাঁদের সামান্য আলোয় তিনি দেখলেন লোকটার মুখে দাড়ি। গায়ে একটা মার্কিনের ফতুয়া। পরনে হেঁটো ধুতি। লোকটা জানলার দিকে মুখ তুলে বলল, "বাবু, একবার নীচে আসবেন ?" রজনীবাবুর অবাক হওয়ার সঙ্গে এবার বিরক্তি যুক্ত হল। তিনি বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "কে তুমি এত রাত্তিরে এসে আমায় ডাকছ কেন ?"

লোকটা আবার বলল, "বাবু, একবার নীচে আসুন না।"

আচ্ছা জ্বালা তো। রজনীবাবু বললেন, "কেন, নীচে যাব কেন ? কী নাম তোমার ?"

লোকটা বলল, "বাবু, আমার নাম নীলমণি। একবার দয়া করে নীচে আসবেন ? আমার ছেলেটার খুব অসুখ।"

জামা পরে ঘরের বাইরে এসে দেখলেন প্যাসেজের চৌকিতে হরিটা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। হরিকে ডাকতে তাঁর মায়া হল। আহা, সারাদিন খাটা খাটুনির পর বেচারা ঘুমোচ্ছে। হাতে তালাচাবি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলেন। বাড়ির বাইরে এসে সদরে তালা লাগালেন। চাবি পকেটে পুরে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন নীলমণি দাঁড়িয়ে আছে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় তোমার ছেলে তার কী হয়েছে ?"

নীলমণি বলল, "বাবু, আমার সঙ্গে আসুন।" নীলমণি হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল। সে বলছিল, "বাবু আমি থাকি শ্রীরামপুরে। নৌকো চালাই, বাবু। আজ দুপুরে এসেছি। কী দুর্ভোগ। ছেলেটা বেহুঁশ হয়ে গেছে। কাউকে চিনি না। তাই দূর থেকে ঘরে আলো জ্বলছে দেখে আশা হল। আপনাকে দেখতে পেলুম।"

গঙ্গার ঘাটে একটা নৌকো বাঁধা ছিল। নীলমণির সঙ্গে রজনীবাবু সেই নৌকোতে উঠলেন। রাত্রিবেলার নিস্তব্ধ নদীতীর। এর মধ্যে হঠাৎ কোথায় যেন একটা কুকুর ডেকে উঠল। নৌকোর ভেতরে একটা টিমটিমে কুপি জ্বলছিল। সেই আলোয় তিনি দেখলেন, কাঁথা মুড়ি দিয়ে একটা ছ'সাত বছরের ছেলে ঘুমোচ্ছে। নীলমণি মুখ নিচু করে আস্তে আস্তে ছেলেকে ডাকল, "কমল, ও কমল।" ছেলের ঘুম ভাঙল না।

নীলমণি ছেলের কপালে হাত দিয়ে শিউরে উঠে বলল,

"জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে বাবু।" রজনীবাবুর দিকে তাকিয়ে নীলমণি ছোট ছেলের মতন ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, "আমার ছেলেকে বাঁচান, বাবু।"

রজনীবাবু বললেন, "তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন ? কমলের না হয় একটু জ্বরই হয়েছে। কেঁদ না। তুমি কিছু চিন্তা কোরো না। নাও, ছেলেটাকে কোলে নাও। চলো আমার বাড়িতে।"

নীলমণি বলল, "না বাবু, আর অন্য কোথাও যাব না। সোজা ডাক্তারের কাছে চলুন বাবু।"

রজনীবাবু তাকে আশ্বস্ত করতে চাইছিলেন। বললেন, "আহা, ব্যস্ত হচ্ছ কেন। সেই জন্যেই তো বাড়িতে যাচ্ছি। আমার বাড়িতে ফোন আছে। ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।"

কিন্তু নীলমণি নাছোড়। সে কেবলই বলে, "না বাবু, সোজা ডাক্তারের কাছে চলুন।" আচ্ছা জ্বালা তো। আচ্ছা অবুঝ তো। রজনীবাবু বিরক্ত হলেন। তবু তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেনই। অবশেষে সে বুঝল।

"বেশ, তবে তাই চলুন," বলে নীলমণি সাবধানে ছেলেকে কোলে তুলল। অন্ধকার রাত্রি। আকাশে অস্পষ্ট চাঁদ। চারদিক নির্জন। রজনীবাবু আগে আগে হাঁটছেন, তাঁর পেছনে কমলকে বুকে নিয়ে নীলমণি। বাড়ির সামনে এসে রজনীবাবু দেখলেন দরজায় তালাটা তেমনি ঝুলছে। তিনি পকেট থেকে চাবি বার করে তালা খুলে ডাকলেন, "এসো নীলমণি।" তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক হলেন। নীলমণি নেই। আশ্চর্য তো। কোথায় গেল ? এই তো পেছনে আসছিল।

রজনীবাবু চাপা গলায় ডাকলেন, "নীলমণি, নীলমণি।" কোনো সাড়া নেই। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন বটগাছটার তলা ফাঁকা। নৌকোর কাছে এগিয়ে দেখবেন কি ? না, সদর দরজা খোলা আছে। আর তিনি কেন নৌকোয় গিয়ে খুঁজবেন ? নীলমণি কি ছেলেমানুষ ? যাকগে, মরুকগে—বলে রজনীবাবু বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। সে রাত্তিরে আর লেখা-টেখা কিছুই হল না।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে রজনীবাবু চা খেতে-খেতে কাগজ পড়ছিলেন। সেই সময় ফোনটা বেজে উঠল। সুপ্রকাশ-বাবুর ফোন। রজনীবাবু সম্পাদক সুপ্রকাশবাবুকে জানালেন আর তিনদিনের মধ্যেই তিনি গল্প পাবেন।

রজনীবাবু রাত্রিতে লেখেন। তাই দুপুরে ঘুমনো তাঁর ধরাবরের অভ্যেস। দুপুরবেলায় ঘুমের মধ্যে মনে হল তাঁর মাথার কাছে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। রজনীবাবু চোখ মেলে দেখলেন নীলমণি। নীলমণি একা থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রজনীবাবু শুয়ে-শুয়েই জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার নীলমণি, কাল হঠাৎ কোথায় পালিয়ে গেলে ? ছেলে কোথায় ?"

নীলমণি দরজার কাছে গিয়ে বলল, "আপনাকে একটা কথা বলতে এলুম বাবু। ছেলেটা পালিয়ে গেছে।" বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আবার চৌকাঠের কাছে ফিরে এল নীলমণি। এসে বলল, "বাবু, আপনার মনটা বড় উঁচু।" নীলমণি চলে গেল। "নীলমণি, শোনো শোনো" বলে রজনীবাবু ধড়মড় করে উঠে বসলেন। একী ! তবে কি তিনি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন ? তিনি চিৎকার করে হরিকে ডাকলেন। হরি ছুটে এল। "কী হল বাবু, এত চেঁচাচ্ছেন কেন ?"

রজনীবাবু হাঁফাচ্ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁরে হরি, দাড়িঅলা একটা লোককে একটু আগে কি আমার ঘরে ঢুকতে দেখেছিস ?"

হরি অবাক। বলে, "কী বলছেন বাবু, দরজা বন্ধ। লোকটোক আসবে কী করে।"

বিকেলবেলায় রজনীবাবু গঙ্গার ধারে গেলেন। ঘাটে সার-সার নৌকো বাঁধা। মাঝিমাল্লারা গল্পগুজব করছে। কেউ কেউ রান্না করছে। একটা নৌকোর গলুইতে বসে একজন থুত্থুড়ে বুড়ো মাঝি তামাক খাচ্ছে। রজনীবাবু বুড়ো মাঝিটাকে ডাক-লেন। মাঝিটা অবাক দৃষ্টিতে রজনীবাবুর আপাদমস্তক নিরী-ক্ষণ করল, তারপর বলল, "মাছ চাইছেন ? না বাবু, মাছটাছ আমাদের কাছে পাবেন না।"

রজনীবাবু বললেন, "না না, মাছটাছের জন্যে আসিনি। তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।" দেখতে দেখতে আরো মাঝি-মাল্লারা এসে ভিড় করল।

বুড়ো মাঝি ব্যস্ত হয়ে উঠল, বলল, "ওরে বাবুকে বসতে দে।" নৌকোর ভেতরে মাদুর পেতে রজনীবাবুকে বসতে দেওয়া হল। তারপর রজনীবাবু বললেন, "আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কেউ নীলমণিকে চেন ?"

সকলে সমস্বরে বলল, "না, নীলমণি বলে আমরা কাউকে চিনি না।" রজনীবাবু তবুও বলে চললেন, "নীলমণি শ্রীরামপুরে থাকে। তার ছেলের নাম কমল।"

বুড়ো মাঝি হুঁকো রেখে বলল, "কী বললেন বাবু। নীলমণি শ্রীরামপুরে থাকে ? ছেলেটার নাম কমল ?" বুড়ো মাঝি কপালে হাত ঠুকে বলতে থাকল, "আশ্চর্য। আমি এক নীল-মণিকে চিনতুম। সেও শ্রীরামপুরে থাকত। তারও ছেলের নাম কমল। সে তো পঞ্চাশ-ষাট সাল আগের কথা বাবু। তারপর কমলটার একদিন ভীষণ জ্বর। হঠাৎ মরে গেল।"

বাড়ি ফিরে সেদিন রাত্তিরে রজনীবাবু নীলমণির গল্পটা লিখলেন। গল্পটা লিখতে-লিখতে তাঁর অনেকবারই মনে হয়েছে কে যেন জানলার নীচে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকছে "বাবু"। চোখ ফিরিয়ে তিনি দেখেছেন কেউ কোথাও নেই। শুধু গঙ্গার পাড়ে বটগাছটা একলা দাঁড়িয়ে আছে।

ছবি সুধীর মৈত্র

চৌত্রিশে হল্যান্ড এসেছিল দারুণ আত্ম বিশ্বাস নিয়ে...
ফ্রান্স আমরা জিতবই
কিন্তু, হায়, মিলান-এ সুইজারল্যান্ডের কাছে ৩-২ গোলে পরাস্ত হল তারা।
34/5
বলা বাহুল্য, ফ্রান্স কিংবা হল্যান্ড হারল কি জিতল, ইতালির লোকদের তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। তাদের একমাত্র কথা, ইতালিকে জিততে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ৭-১ গোলে হারাল ইতালি। এবারে ফ্লোরেন্সে তাদের কোয়ার্টার ফাইনালের খেলা পড়ল স্পেনের বিরুদ্ধে...
ফোর্জা!
স্পেনের রক্ষণভাগ, বিশেষ করে জামোরা সেদিন দারুণ লড়েছিলেন...
34/6
ফোর্জা ইতালিয়া!
ইতালিয়া!
ইতালিয়া!
স্পেনের পক্ষে গোল করলেন রেঁগিরো। ইতালির পক্ষে শোধ দিলেন ফেরারি। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পরে খেলা ড্র... পরদিন আবার খেলা হবে...
ফ্লোরেন্সের সেই খেলায় অনেকে আহত হয়েছিলেন...
আহতদের মধ্যে ছিলেন লানাগারা, গরসটিজা, ইরারাগোরি, সিরিয়াসো, লাফুয়েন্তে, জামোরা, চিয়াডিয়ো, ফেরারি ও আরও অনেকে...
পরের দিনও একই ব্যাপার। শুরুতেই আহত হলেন বিখ্যাত খেলোয়াড় বশ্। স্পেনের খেলোয়াড়রা প্রাণপণে লড়তে লাগলেন...কিন্তু তখন তাঁরা হৃতশক্তি...
মেয়াজ্জার গোলে ইতালি সেদিন কোনোক্রমে জিতে যায়!
34/7
ইতালির সবচেয়ে মারকুটে খেলোয়াড় ছিলেন লুইগি মন্টি। পরে তিনি আর্জেন্টিনার নাগরিকত্ব নেন। বিপক্ষের খেলোয়াড়কে জখম করাই যেন ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।
সেবারকার সেমিফাইনালে অস্ট্রিয়ার খেলোয়াড়দেরও তিনি নির্বিচারে জখম করেছিলেন।
অস্ট্রিয়ার খেলায় শিল্প-সুষমা ছিল, কিন্তু মারদাঙ্গার মোকাবিলা তাঁরা করতে পারেননি...
34/8
(এর পর আগামী সংখ্যায়)

লড়াই

গত মাসের চোদ্দ তারিখের ঘটনা। সকাল তখন আটটা। পড়ার ঘরে বসে পড়ছি। হঠাৎ খুব গোলমাল শুনে জানলায় গেলাম। দেখি, আমাদের বাড়ির সামনের মাঠটায় দুটো ষাঁড় লড়াই করছে। দুটোই তাগড়া। তবে একটার বয়েস বেশি, আর একটা জোয়ান।

সামনের রাস্তার কালভার্টের উপরে লোক দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। ষাঁড় দুটো তখন একজন আর একজনের মাথায় ঠেস দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কখনও এ ওকে একটু ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

বুড়ো ষাঁড়টার শিং ভেঙে রক্ত পড়ছে। দুজনেই খুব ক্লান্ত। ওরা দাঁড়িয়ে থাকলে মজা নষ্ট হয়ে যায়, তাই কেউ-কেউ ঢিল মেরে ওদের লড়ার জন্য উশকে দিচ্ছিল। বাজারে যাওয়ার সময় বলে অনেক লোক ছিল। সবাই একটা হেস্তনেস্ত দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। হয়েও গেল প্রায় আধ ঘণ্টা। এমন সময় পচাকাকা একটা মোটা বাঁশ নিয়ে সবার রসভঙ্গ করে ষাঁড় দুটোকে দড়াম দড়াম করে পিটতে লাগলেন। ষাঁড় দুটো তখন ছুটে পালাল দুদিকে।

পলাশ ঘোষ (বয়স—১১)

বাচ্চা চড়ুই

বাড়ির উঠোনে বাতাবিলেবু গাছের ছায়ায় রোজ সকালে আমি পড়তে বসি। বাতাবি গাছে অসংখ্য সাদা ফুল ধরেছে।

সেদিন ছিল শুক্রবার। আমি পড়তে বসেছিলাম। লেবু গাছে কয়েকটি চড়ুই ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে উড়ছিল, আর দু' একটি লেবুফুল ঝরে পড়ছিল। হঠাৎ দেখি একটি বাচ্চা চড়ুই উঠোনে ধপাস করে পড়ল। সে তখনও খুব ভাল উড়তে শেখেনি। বাচ্চাটি পড়তেই আমাদের কালো রঙের মুরগীটি তাকে ঠোকরাতে ছুটে এল। আমি তাড়া করতেই মুরগীটি পালিয়ে গেল। কিন্তু বাচ্চা পাখিটি উড়ে পালাতে পারল না। তাকে হাতের মুঠোয় ধরে ফেললাম। আর তখন দেখলাম, দুটি বড় চড়ুই খুব চিৎকার করতে করতে গাছে লাফালাফি করছে। ওরা বোধ হয় বাচ্চা চড়ুইয়ের মা-বাবা। তাদের বাচ্চাকে ধরেছিলাম বলে হয়ত ভেবেছিল, আমরা ওদের বাচ্চাকে ধরে নিয়ে পালাচ্ছি। একটু পরে আমি হাতের মুঠো আলগা করতেই বাচ্চাটি লাফিয়ে-লাফিয়ে তার মা-বাবার কাছে চলে গেল। তখন বড় চড়ুই দু'টি শান্ত হল।

কঙ্কাবতী সরকার (বয়স—১৪)

চিঠি

আমি মাসিক আনন্দমেলার পাঠক। লেখা-পড়া, লাল বম্বেটের গুপ্তধন, খেলাধুলো ও গল্প পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। এই পত্রিকাটি ১৫ দিন অন্তর বার হলে খুব ভাল হয়।

পার্থ ঘোষ (বয়স—৯)

আমার কুকুর

আমার একটা কুকুর ছিল। তার নাম পমি। আমি ওকে খুব ভালবাসতাম। আমি যা খেতাম, ওকে তাই খেতে দিতাম। ওকে আমি পাশে নিয়ে শুতাম।

একদিন আমরা ওকে রেখে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম। এসে দেখি, ও অভিমান করে বসে আছে। আমার সঙ্গে কথাই বলছে না। আমি তখন ওকে পোষা বাঘ খৈরির গল্প বলতেই ও আমার কোলে এসে বসল। তখন বুঝলাম, আমরা যেমন খৈরির কথা শুনে আনন্দ পাই, ও-ও তেমন পায়।

মৌমুমী ভট্টাচার্য (বয়স—১০)

বেচারা রাজা

আমাদের এই রাজ্যে ছিল
ছোট্ট একটি রাজা,
দেখেছিলাম সেই বেচারার
দুই পায়েতে হাজা।
হাজার জন্য কষ্ট ভারি
চলত রাজা খুঁড়িয়ে।
দেখতে দেখতে যুবক রাজা
হঠাৎ গেল বুড়িয়ে।

তন্ময় চক্রবর্তী (বয়স-৯)

সবার কথা

তাতা খায় আতা,
তিন্নি খায় সিন্নি।
তাতা তিন্নি ভাই বোন,
নিজের মনেই থাকে আপন।
মিতুল আমার মাসি,
ক্যাডবেরি দেয় রাশি-রাশি।
ওর মেয়ে ফুলটুসি,
থাকে সদাই হাসিখুশি।
ওর বেড়াল টুকটুক,
দুধ খায় চুকচুক।

দেবশ্রী লাহিড়ী (বয়স—৭)

আজব ডাক্তারি

আজব দেশের ডাক্তারিটা
হল ভারি হাসির
আইসক্রীমকে তারা বলে
এটাই ওষুধ কাশির
থার্মোমিটার দিয়ে তারা
লোকের প্রেসার দেখে
হৃদরোগের রুগিরা খায়
ভাজেতে তেল মেখে।

অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায় (বয়স—৯)

ছবি এঁকেছে কৌশিক লাহিড়ী (বয়স—১০)

অপরূপ ভুটান

দীপঙ্কর সেন

দুধারের বিস্তৃত চা-বাগানের ভেতর দিয়ে ভুটানের ফুন্টশেলিংয়ে প্রবেশ করলাম। ফুন্টশেলিং-এর অর্থ পাহাড়ের পাদদেশ। বেশ বড় জায়গা। দোকান বাজার হোটেল সবই আছে। এখান থেকেই ভুটানে প্রবেশের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয়, এবং লিখিত পারমিট নিতে হয় থিম্পু ও পারো যাওয়ার জন্য। শহরের পাশ দিয়ে ডোরসা নদী বয়ে চলেছে। তার পরেই চমৎকার পাহাড়। হোটেল ড্রিংক-এ মধ্যাহ্নভোজন সেরে আমরা রওনা দিলাম বেলা দেড়টায়। গাড়িতে তেল ভরে নেওয়া হল।

ফুন্টশেলিংয়ের পরে ফিতের মতো সরু রাস্তা সোজা উঠে গেছে পাহাড়ে। রাস্তা ভাল, তবে অসম্ভব চড়াই। এক পাশে গভীর খাদ, আর এক পাশে পাহাড়। মাঝে-মাঝে বাঁকের মুখে নীচের ডোরসা নদী এবং ফুন্টশেলিং শহর দেখা যায়। ঠিক ছবির মতন। রাস্তায় দু'একটা ছোট বাড়ি ছাড়া কোনও লোকালয় চোখে পড়ে না।

রাত্রে চুখা গেস্ট হাউসে থাকলাম। নতুন দোতলা বাড়ি, আসবাবপত্রও চমৎকার। চৌকিদারের হাতের রান্নাটিও খাসা। রান্নার তরিতরকারি ইত্যাদি অনেক ওপরে থিম্পু যাওয়ার বড় রাস্তার ওপর চিমাকোঠি থেকে কিনে আনতে হয়।

পরদিন সকালে চুখা ছেড়ে চড়াই ভাঙা শুরু হল। খানিকটা উঠে এলেই চিমাকোঠি। এখানে হাইডেল প্রজেকটের কয়েকটি অফিস, কোয়ার্টার্স, বাংলো ও কিছু দোকানপাট আছে। কর্ম-সূত্রে বিভিন্ন প্রদেশের লোকের এখানে বাস।

চিমাকোঠি ছাড়িয়ে একটু এগোতেই বরফের চূড়া চোখে পড়ল। তারপরেই দেখতে পেলাম পাইন গাছ। পাহাড়ের গায়ে ঘন জংগল। খুব ছোট্ট নীল রংয়ের পাখি ডাল থেকে ডালে উড়ে বেড়াচ্ছে। এক জায়গায় গাছের ডালে উজ্জ্বল আভাযুক্ত কেশরওয়ালা মুখপোড়া হনুমান চোখে পড়ল। পরে জানা গেল আমরা দুষ্প্রাপ্য গোল্ডেন হিমালয়ান লাঙ্গুর দেখেছি।

ঘন্টা-দেড়েক বাদে নদীর ধারে এই রাস্তার শেষ চেক পোস্ট পড়ল। চেক পোস্টের নীচেই থিম্পু থেকে বয়ে আসা থিন-চু আর পারো থেকে বয়ে আসা পা-চু নদীর সংগম। ভুটানি ভাষায় চু অর্থে নদী। চেক পোস্টের বাঁ হাতি নদী পেরিয়ে দুদিকে দুটি রাস্তা চলে গেছে। একটি রাস্তা গেছে হা-র দিকে, অপরটি গেছে পা-চুর কিনারা ধরে পারো পর্যন্ত।

আমরা থিম্পুর দিকেই রওনা হলাম। ভুটানের প্রাচীন সিমটোখা জং ছাড়িয়ে বাঁক পেরোতেই থিম্পু চোখে পড়ল। থিম্পু শহরটি গড়ে উঠেছে একটি বড় উপত্যকার ওপর। সুন্দর ছোট্ট শহর। প্রত্যেকটি বাড়ি এবং দোকানে আছে রঙিন কাঠের নকশা, ওপরে নানা রঙের টিনের ছাদ। শহরের পাশ দিয়ে থিন-চু বয়ে যাচ্ছে। ভুটান রাজত্বের আয়তন প্রায় ৪৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার। প্রাক্তন রাজা জিগমে দোরজি ওয়াংচুর আমল থেকে থিম্পু ভুটানের রাজধানী। এর আগে এটি ছিল গ্রীষ্মকালীন রাজধানী।

শহরের বাজার এলাকা ছাড়িয়ে খানিকটা গেলেই ভুটান হোটেল। পরিচ্ছন্ন, সুন্দর হোটেল। এখানকার হোটেলগুলি সরকারি। ভুটানের শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু শিক্ষান্তে পাঁচ বছর সরকারি কাজ করা বাধ্যতামূলক। হোটেলের প্রায় সব কর্মচারীই ইংরেজি জানে। এদের পরনে ভুটানি পোশাক খো

পারোর একটি দৃশ্য

লক্ষ্যভেদের খেলা চলেছে

প্রচলিত নাম 'বকু'। পোশাকটি ঢিলেঢালা সাহেবি ড্রেসিং গাউনের মতো। সামনের ভাঁজের ভেতরের পকেটে সাধারণ ভুটানি যাবতীয় জিনিস বহন করে। মেয়েদের পোশাকের নাম 'কিরা'।

হোটেলে বিভিন্ন ভুটানি খাবার দিয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজ সেরে একটু গড়িয়ে নেওয়া হল। সাড়ে-তিনটে নাগাদ শহর পরিক্রমায় বেরিয়ে প্রাক্তন মহারাজার সমাধি, বাজার ইত্যাদি দেখে নদীর ধারের রাস্তায় এসে হাজির হলাম।

এক পাশে স্টেডিয়াম, ভুটানি কায়দায় বানানো দুটি প্যাভিলিয়ন। কাঠের কারুকার্য, রংয়ের বাহার ও জেল্লা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এইখানেই ১৯৭১ সালে বর্তমান রাজার

অভিষেক হয়েছিল। সেই উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য পৃথিবীর নানা জায়গা এবং ভারত থেকে মান্যগণ্য অতিথিরা থিম্পুতে এসেছিলেন।

খানিকদূর গিয়ে দেখা গেল, একদল তীরন্দাজ তীর ছুঁড়ছে। সকলেই বাজি ধরে খেলছে। এটি হল এক ধরনের জুয়া। ওদিকে কুমারদার ছবি তোলা চলছে তো চলছেই। সন্ধের অন্ধকার নামলে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

দোকানের সামনে ভুটানি ছেলেরা

একদা ভুটানের বিভিন্ন অঞ্চলে লামারা শাসন চালাতেন। প্রায় ৩০০ বছর আগে শেপটুন-লা-ফা নামে একজন বিশিষ্ট পরিব্রাজক লামা ধর্মরাজা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর নানা ঘটনা ও ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান রাজবংশের প্রথম পুরুষ জিগমে নামগিয়াল ভুটানের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র উগিয়েন ওয়াংচু ১৯০৭ সালে বংশানুক্রমিক রাজা হিসাবে স্বীকৃত হন। বলা যেতে পারে যে, ভুটানের ইতিহাসে ইনিই প্রথম রাজা। এঁর ছেলে জিগমে ওয়াংচু ১৯৫২ পর্যন্ত রাজত্ব চালান। ১৯৫২-৭১ বর্তমান রাজার পিতা জিগমে দোরজি ওয়াংচুর রাজত্বকাল। এঁর রাজত্বকালে ভুটানের খুব উন্নতি হয়। বর্তমান রাজা জিগমে সিংগিয়ে ওয়াংচু।

শিল্পোদ্যোগে ভুটান এখনও অনগ্রসর। ভুটান ডিস্টিলারি এবং ভুটান ফুড প্রসেসিং ফ্যাক্টরি ছাড়া আর কিছু নেই। সরকারি উদ্যোগে সম্প্রতি একটি সিমেন্ট কারখানা বানানোর কথা চলছে।

পরদিন সকালে কিছুক্ষণ-বেড়িয়ে ফেরার পথে বন বিভাগের অফিস-প্রাঙ্গণে তারের খাঁচায় দুটি বড় চিতা বাঘ, কয়েকটি হরিণ এবং একটি ধূসর রঙের প্রকাণ্ড বনবেড়াল দেখলাম আমরা।

প্রাতরাশ সেরে থিম্পুর টাসেঁচো জং দেখতে গেলাম। শোনা যায়, এই জংটি নাকি নকশা ছাড়াই বানানো হয়েছে। জংয়ের মধ্যবর্তী বৌদ্ধ মঠটি প্রাচীন। মঠের অনেক লামা আছেন, এঁদের মধ্যে চার বছরের শিশু থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধ চোখে পড়ে। ভুটানের মন্ত্রিশালা এবং মহাকরণ জংয়ের মধ্যে অবস্থিত। এর মধ্যেই রাজা দর্শনার্থীদের দর্শন দেন। এখানে নিঃশব্দে কয়েক হাজার লোক কাজ করছিল। ভেতরে ঢুকতে হলে ভুটানি পোশাক পরতে হয়।

আবহাওয়া ভাল না থাকার জন্যে দোচু-লা যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করতে হল। দোচু-লা ন হাজার ফুট উঁচু গিরিখাত (লা-এর অর্থ গিরিখাত) সেখান থেকে নয়নাভিরাম গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়।

এরপর আমরা রওনা দিলাম পারোর দিকে। পারোর পথে দ্রষ্টব্য কিছুই নেই। দু পাশে নেড়া পাহাড় আর মাঝখান দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। পারোতে আমরা উঠলাম ওলাথাং হোটেলে। এখন পারো ভুটানের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী।

১৯৬২ সালের অকটোবর মাসে ভুটানের প্রথম ডাকটিকিট বার হয়। মার্কিন চন্দ্রাভিযানের সময় থেকে ভুটান থ্রি ডাইমেনশনাল টিকিট বার করছে। বিভিন্ন ধরনের মুখোস, গাড়ি ইত্যাদির ডাকটিকিট খুবই চিত্তাকর্ষক।

পরদিন ভোরে উঠে চোমলহরী শৃঙ্গ দেখতে গেলাম।

একটি জংয়ের ধ্বংসাবশেষের পশ্চাৎপটে চোমলহরী। এইখানেই তিব্বতী আক্রমণকারীরা যুগ-যুগ ধরে ভুটানিদের দ্বারা প্রতিহত হয়েছে।

ফেরার পথে নদীর উলটো দিকের পাহাড়ের মাথায় দেখলাম তাকসাং মনেস্টারি। মনেস্টারিটি খাড়া পাহাড়ের দেয়ালের ওপর। ভাবতে বিস্ময় জাগে, কী ভাবে এটি তৈরি করা হয়েছিল। তাকসাং শব্দের অর্থ—বাঘের গুহা। কথিত আছে, গুরু পদ্মসম্ভব নাকি একটি উড়ন্ত বাঘের পিঠে চড়ে এখানে এসে নামেন।

পারো শহরে ফিরে এসে নদী পেরিয়ে আর একটি জং দেখতে যাওয়া হল। এই জংটি দুশো বছরের প্রাচীন। ১৯৬৭ সাল থেকে এই পাঁচতলা জং ভুটানের জাতীয় সংরক্ষণাগার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে নীচের প্রকোষ্ঠে সযত্নে রক্ষিত আছে একটি ঘোড়ার ডিম! আয়তনে বেশ বড়সড় একটি সাদা ডিম্বাকৃতি বস্তু, যা নাকি চারশো বছর আগে কোনও ঘোটকী গর্ভে ধারণ করেছিল। যাক, আমাদের কপালে ঘোড়ার ডিম দেখাও ছিল! এখানে বহু প্রাচীন ভুটানি তাংখা, কার্পেট, অস্ত্রশস্ত্র, রাজাদের পোশাক, মুদ্রা, ডাকটিকিট, বিভিন্ন সময়ের দেবদেবী, বৌদ্ধমূর্তি ইত্যাদি অনেক কিছু দেখার আছে। একেবারে ওপরের প্রকোষ্ঠটি একটি বৌদ্ধ মন্দির।

ফিরতি পথে নদী পেরিয়ে পারোর প্রাসাদ 'উগেনপেলরি' দেখতে যাওয়া হল। প্রাসাদটি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হলেও রাজমাতার উপস্থিতির জন্যে এ-যাত্রা আমাদের আর প্রাসাদে ঢোকা হল না।

প্রাসাদ থেকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে রিনচেংপাং (পারো) জং দেখতে গেলাম। জংটি নদীর অপর পারে অবস্থিত। শোনা যায়, একজন লামা এই জায়গাটি পদ্মসম্ভবকে উপহার দেন, এবং কালক্রমে এই জংটি তৈরি হয়।

হোটেলে ফিরে মধ্যাহ্ন-ভোজের পরে একটু বিশ্রাম করে রওনা দিলাম ঘরের পথে। রাতটা আবার চুয়ার গেস্ট হাউসে কাটিয়ে পরদিন ধীরে-সুস্থে শিলিগুড়ি। সেখান থেকে রাতের ট্রেন ধরে কলকাতা।

লেখক : কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গোয়েন্দা বাজ

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

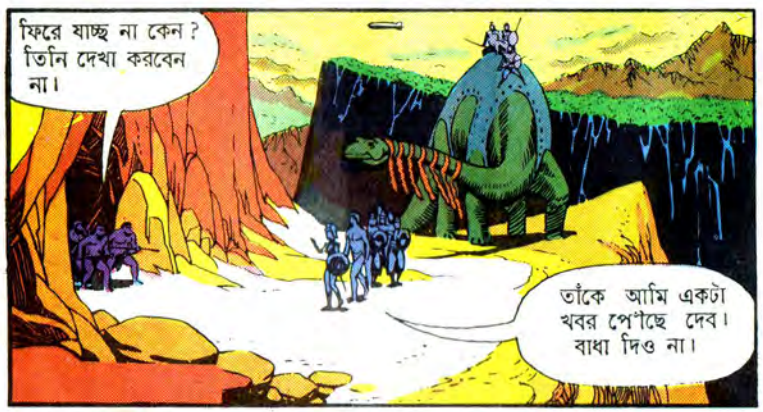

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
লো-হারের অধিপতি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন না মানে? তিনি কি জানেন যে, আমরা সারি শহরের যোদ্ধা?
জানেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি দেখা করবেন না।
ভন হর্স্ট কি তোমাদের শত্রু?
জানি না। আসলে এই মানুষটি সম্পর্কে খুব কম কথাই আমরা জানি।
ফিরে যাচ্ছ না কেন? তিনি দেখা করবেন না।
তাঁকে আমি একটা খবর পোঁছে দেব। বাধা দিও না।
বেশ, তাহলে এসো।
কারও সঙ্গে কথা বলেন না তিনি। অন্ধকারে একা বসে-বসে কী যেন ভাবেন।
কোথায় তিনি?
ওই তো আমাদের অধিপতি ভন হর্স্ট!
কী অন্ধকার জায়গা!
লো-হারের ভন হর্স্ট! আমি রাজকীয় বাহিনীর জেন-কুয়া রেনা। সারির সম্রাজ্ঞী ডিয়ান আপনাকে একটা খবর পাঠিয়েছেন।
চলে যাও তোমরা... আমাকে একা থাকতে দাও!
এ কী, এ যে লেফটেন্যান্ট!
কে? কে তুমি?
ও, টারজান? তা তুমি কেন এই নরকে ফিরে এলে?
ডেভিড ইনেসের জরুরী বার্তা পেয়ে। শুধু এই পাতাল-রাজ্য পেলুসিডার নয়, গোটা পৃথিবীরই নাকি দারুণ বিপদ ঘনিয়ে আসছে।
ভালই তো, ভালই তো, ঈশ্বর এবারে সবকিছু শেষ করে ছাড়বেন!
আমি চাই, এই নরককুণ্ডকে তিনি একেবারে ধ্বংস করে ছাড়ুন!

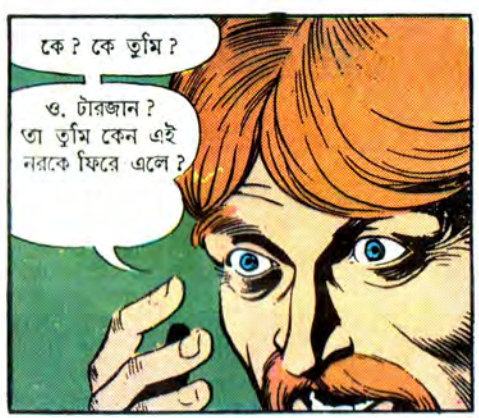

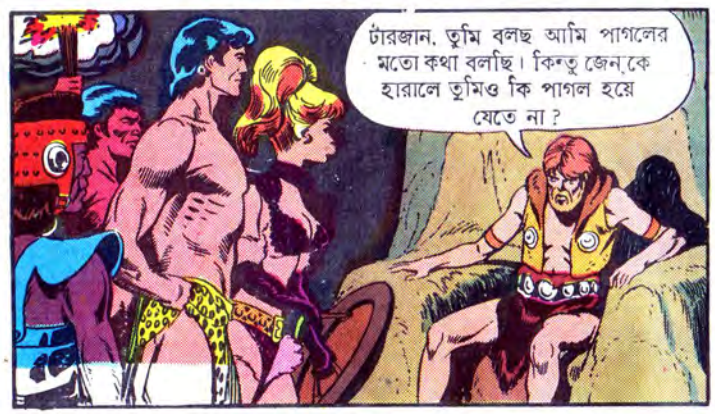

টারজান আর তাঁর সঙ্গীরা এখনও গুহার মধ্যে রয়েছেন, ক্যাপ্টেন হাইনস!
এখুনি তাঁর বেরিয়ে আসা দরকার, মুগাম্বি! ঝড় আসছে। এখানকার ঝড় বড় ভয়ংকর! টারজানকে ছেড়েই না আমাদের চলে যেতে হয়!
একবার আমি এখানকার ঝড়ের মধ্যে পড়েছিলাম। বরাতজোরে সেবারে বেঁচে যাই।
তুমি তাহলে জানো!
লেফটেন্যাণ্ট মেক্‌বি, তৈরি থাকো, টারজান বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে তুলে নেব।
টারজান, তুমি বলছ আমি পাগলের মতো কথা বলছি। কিন্তু জেন্‌কে হারালে তুমিও কি পাগল হয়ে যেতে না?
সাগোথ্‌রা আমার স্ত্রী লা-জাকে কেড়ে নেয়...
লড়াই করতে-করতে আমি জ্ঞান হারাই। জ্ঞান ফিরে পাবার পরে দেখি যে, লা-জাকে তারা হত্যা করেছে!
এখন তুমি বলছ, পেলুসিডার ধ্বংস হবে!
ভাল ভাল, সবকিছু ধ্বংস হোক! ধ্বংস হোক এই পাতালপুরী!
সম্রাজ্ঞী ডিয়ান আপনার সাহায্য চান! সারি-শহর ধ্বংস হয়েছে! সম্রাট ইনেসও নিখোঁজ!
তাতে আমার বয়েই গেল! যা-ই করি না কেন, লা-জা তো আর বেঁচে উঠবে না!
শোনো ভন হর্স্ট। ডেভিড ইনেস যে তিনটি ব্যাপার সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, তা হল ভূমিকম্প, মাহার এবং—সাগোথ!
সাগোথ?
এ কী! এ কী!
ভূমিকম্প!

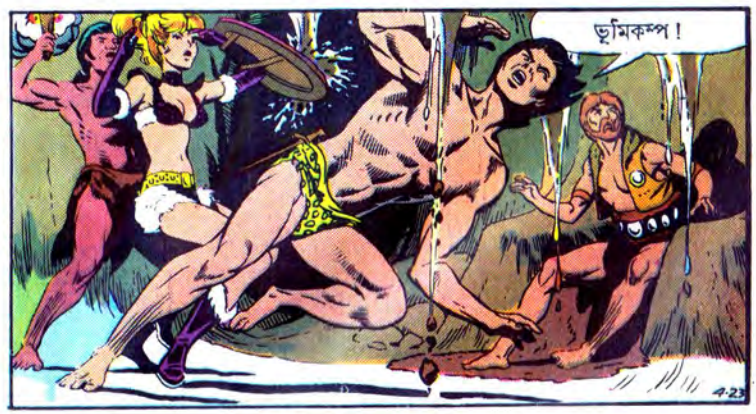

শব্দ সন্ধান

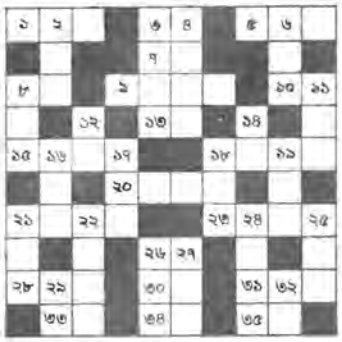

সংকেত : পাশাপাশি : (১) দানবদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় অর্জুনের সারথি ছিলেন। (৩) ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০০০ ফুট উঁচু মরুভূমি। (৫) বাজনা। (৭) উলটে নিলে রঙ। (৮) মানুষ বা ভুবন। (৯) বমুনোত্তীরের তীর্থস্থান। (১০) উপকারী পানীয়। (১৩) তিন-চতুর্থাংশ পৃথিবী। (১৫) ধনুক। (১৮) প্রথম জুটি আর দ্বিতীয় জুটির একাধিক অর্থ, কিন্তু সব মিলিয়ে নুন। (২০) পথিক। (২১) মাইকেল মধুসূদনের ছিল। (২৩) অতীতের এক সুরসিক। (২৬) মহাসাগরীয় দ্বীপ, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির এখানে আছে। (২৮) ব্যাকরণে পাবে। (৩০) দেরি; শব্দের পরে বসলে প্রত্যয়। (৩১) প্রাচীন রাজ্য। (৩৩) শরীরে প্রায়ই চিহ্ন রেখে যায়। (৩৪) রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন, "তবে উঠে এসো—"। (৩৫) লক্ষ্মী।

উপর-নীচ : (২) সূত্রধর; পৌরাণিক এক রাজার মৃত্যুর কারণ। (৩) এক ধরনের সৈন্য। (৪) সংগীতের একটি রাগ। (৬) নাম শুনলেই হাতির কথা মনে পড়ে। (৮) জনৈক মুনি। (১১) কাঠ চেরাই করে। (১২) প্রাচীন ভারতীয় কবি। (১৪) ভারত-পাকিস্তানের মরুভূমি। (১৬) জন্মের পর পিতা গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। (১৭) দানব, ইন্দ্রের হাতে মৃত্যু হয়েছিল। (১৮) ফুলের নাম। (১৯) উলটে নাও, গুলি বেরুবে। (২১) রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই। (২২) মূল্যবান মণি। (২৪) সমুদ্র, তবে একজন ঋষি-কবিরও পরিচয় জড়িত। (২৫) শুকনো ফল, অথচ দামী মসলা। (২৬) বুদ্ধদেবের বহু জন্মের কাহিনী। (২৭) প্রাচীন ভারতীয় কবি। (২৯) রাক্ষস। (৩২) লাতিন আমেরিকার একটি দেশের রাজধানী।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ধাঁধা

"দারুণ মজা হল আজ।" ছোটকা জামাটা হ্যাঙ্গারে রাখতে-রাখতে বলল।

ছোটকার অফিসের কোন্ এক সহকর্মীর মেয়ের জন্মদিন ছিল। রাতে খাবার নেমন্তন্ন সেরে সদ্য ফিরেছে। আমিও পড়াশুনো শেষ করে ছাতেই অপেক্ষা করছিলাম। ধাঁধা নেব ছোটকার কাছ থেকে।

ছোটকা যে সঙ্গে করেই ধাঁধা এনেছে কে জানত। ছোটকার মুখে মজার কথা শুনে জিজ্ঞেস করলাম, "ধাঁধা শোনালে বুঝি?"

ছোটকার ততক্ষণে জামা-কাপড় পাল্টানো শেষ। ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসে বলল, "ধাঁধা আর শোনালাম কই। তার আগেই দারুণ একটা ধাঁধা পেয়ে গেলাম।"

ছোটকা যখন পুরো ব্যাপারটা বলল তখন বুঝতে পারলাম, মজা যেমন রয়েছে ধাঁধাটাতে, মাথাও তেমনি ঘামাবার মতো ধাঁধা এটা। সুতরাং এই ধাঁধাটা দিয়েই এবারের ধাঁধা শুরু হোক বরং।

প্রথম ধাঁধা ॥ শ্রীযুক্ত কর, শ্রীযুক্ত খাস্তগীর, শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলি আর শ্রীযুক্ত ঘোষ -চার বন্ধু। এঁদের চার মেয়ে। চার মেয়ের নাম আর আলাদা করে বললাম না। করের মেয়ে ক, খাস্তগীরের খ, গাঙ্গুলীর গ, আর ঘোষ-মশাইয়ের মেয়ে—ঘ।

তা চার বন্ধু মিলে ঠিক করলেন, একটা মজার খেলা খেলবেন। খেলাটা হল, চার মেয়ের মধ্যে কে সব থেকে ভাল, তা ঠিক করা হবে ভোট নিয়ে। যে সব থেকে বেশি ভোট পাবে তাকে একটা স্পেশাল প্রাইজ দেওয়া হবে।

কিন্তু কীভাবে নেওয়া হবে ভোট? তার একটা নিয়মও ঠিক করে ফেলা হয়েছে। প্রত্যেক বন্ধু পাঁচটি করে ভোট দেবেন। পাঁচটি ভোটই দিতে হবে প্রত্যেককে। ভোট নষ্ট করা চলবে না। যেভাবে খুশি ভোট দেওয়া যাবে। শুধু কোনো একটি মেয়েকে একজন তিনটির বেশি ভোট দিতে পারবেন না।

সবাই খুশি এই নিয়মে। ভোটপত্র দেওয়া হল প্রত্যেককে। ভোট দিলেন তাঁরা। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কেউই তাঁর পাঁচটি ভোট এমনভাবে ভাগ করেননি যা অন্য কারও সঙ্গে মিলে যায়। প্রত্যেকে তাঁর পাঁচটি ভোট নিজস্ব হিসেবে ভাগ করেছেন। অন্য কারও সঙ্গে তার কোনো মিল নেই হিসেবে।

যেমন, খাস্তগীর তাঁর প্রত্যেক বন্ধুর মেয়েকে সমান ভোট দেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। ঘোষ তাঁর মেয়েকে যত বেশি সম্ভব তত ভোট দিয়ে রেখেছিলেন। গাঙ্গুলি ভেবেছিলেন, তাঁর মেয়ে এমনিতেই জিতে যাবে, তিনি নিজের মেয়েকে কোনো ভোট দেননি, অন্য তিনজনকে ভাগ করে দিয়েছিলেন তাঁর ভোট। শ্রীযুক্ত কর 'গ' ও 'খ'-কে সমান ভোট দিয়েছিলেন।

কিন্তু এতসব কান্ড করে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, প্রত্যেকের মেয়েই মোট পাঁচটি করে ভোট পেয়েছে। কেউ বেশি পায়নি, কেউ কম পায়নি।

এখন বলো তো, 'ক' মানে শ্রীযুক্ত করের মেয়ে কার কাছে কত ভোট পেয়েছিল?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ পর-পর তিন সংখ্যার যোগফল ৩০০। সংখ্যা তিনটে বলতে পারো?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ কাজচাল, মইছাতী, মলয়রাঙ্গা, তমালা, সতীশ্বর—কয়েকটা নাম ওলট পালট করে লেখা হল। ঠিক করে লিখে বলতে পারো, নামগুলো কিসের?

চতুর্থ ধাঁধা ॥ উপযুক্ত সংখ্যা বসাও—

২০ (১৫০) ১৫

১০ (?) ৭

গতবারের উত্তর ॥ (১) গৌরী বা মায়া কেউ বাদামি শাড়ি পরেনি (সূত্র-খ), নীলার বাদামি শাড়ি নেই (সূত্র-গ), সুতরাং প্রতিমাই বাদামি শাড়ি পরেছিল।

নীলা গেরুয়া শাড়ি পরেনি (সূত্র-গ) গৌরী গেরুয়া পরতে পারে না (সূত্র-ক) তাহলে মায়ার শাড়ির রঙই গেরুয়া।

নীলা নীল শাড়ি পরবে না, সুতরাং তার শাড়ির রঙ সবুজ এবং নীল শাড়ি পরেছিল গৌরী।

(২) খ্রীস্টপূর্ব অব্দ নিশ্চয়ই খ্রীস্ট জন্মানোর আগে জানা সম্ভবপর নয়। সুতরাং মুদ্রাটি জাল।

(৩) অভিযানে (৪) ১০

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল দেশলাই-কাঠির মাথার বারুদের ছবি ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ শিশুর শরীরের কোন অংশ জন্ম থেকেই বৃদ্ধ?
উঃ বুড়ো আঙুল।

প্রঃ মিশরের পিরামিড-কে উল্টো করে বসানো যায়?
উঃ হ্যাঁ, যায়। ডমিরাপি।

প্রঃ রাওয়ালপিন্ডি শহরটা কোথায়?
উঃ নাম শুনে তো মনে হয় গয়ার কাছে।

প্রঃ মশারির মধ্যে শুয়ে হঠাৎ লক্ষ করলাম যে, মশারির গায়ে একটা ফুটো, আর সেই ফুটো দিয়ে মশা ঢুকছে। কী করে মশা তাড়ানো যাবে?
উঃ তাড়াতে হবে কেন? যখন দেখবে শেষ মশাটা ঢুকে গেছে, মশারি থেকে বেরিয়ে মেঝেতে বিছানা পেতে শোবো।

প্রঃ কোন ফলের সঙ্গে চিত্রকরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক?
উঃ কলা।

প্রঃ বাংলা ব্যাকরণের কোন অধ্যায়টা উল্টে রাখলেও তার থেকে নিস্তার নেই?
উঃ সমাস। ওল্টালেও সেই সমাস।

প্রঃ দশজনেও কখন একা মনে হয়?
উঃ আরও একজন ষোল হয়ে যখন একাদশ হয়?

সুসেন

মজার খেলা

তিনটে কাপ নিয়ে আরেকটি দারুণ মজার খেলা দেখানো যায়। খেলা না ম্যাজিক? সেটা পরে ভাবা যাবে. আগে তো খেলাটা শিখে ফেলো।

টেবিলে একরকম মাপের ও একরকম চেহারার তিনটে কাপ উপুড় করে রাখো। এবার বন্ধুদের বলো, তোমাকে না জানিয়ে যে-কোনো একটা কাপের তলায় একটা পয়সা যেন লুকিয়ে রাখে তারা। কোন্ কাপের তলায় পয়সাটা রাখবে. সেটা তারাই ঠিক করবে। তোমাকে কিছু জানাবে না। শুধু পয়সাটা রেখে আরেকটা কাজ করতে হবে। সেটা হল, যে-কাপের তলায় পয়সা রাখা হল, সে-কাপটাকে বাদ দিয়ে অন্য দুটো কাপের জায়গা বদল করে দিতে হবে। অর্থাৎ মাঝের কাপটার তলায় পয়সা রাখলে, দু-পাশের দুটো কাপের জায়গা বদল হবে। এই রকম আর কী।

যতক্ষণ ধরে তারা পয়সা রাখবে এবং রেখে অন্য দুই কাপের জায়গা বদল করবে, ততক্ষণ তুমি পিছন ফিরে থাকবে। সব হয়ে গেলে তুমি টেবিলের দিকে ফিরবে। আর তক্ষুনি ঠিক-ঠিক বলে দেবে—কোন্ কাপটির তলায় পয়সা রয়েছে। হ্যাঁ, বলে দিতে পারবে। একেবারে ঠিক-ঠিক। একবার নয় যতবার খুশি। এবার বুঝতে পারছ খেলাটিকে কেন ম্যাজিক বলছি?

কী করে বলবে ভাবছ? খুব সোজা। তিনটে কাপের যে-কোনো একটার পিছনে যে-কোনো একটা চিহ্ন দিয়ে রাখবে তুমি। যেমন ধরো, পেন্সিলের একটা ছোট্ট দাগ। অনেক সময় কাপের পিছনেও এমন কোনো দাগ থাকে যা কাপটাকে চিনতে সাহায্য করে। আরম্ভে এই চিহ্ন-দেওয়া কাপটা কোন্ জায়গায় থাকে ভাল করে দেখে নেবে। তারপর বন্ধুরা যখন সব কিছু করে তোমায় ডাকবে. তখন তোমার কাজ হবে চিহ্ন-দেওয়া কাপটি কোথায় রয়েছে সেটা দেখা। যদি দেখ, কাপটি আগের জায়গাতেই রয়েছে. তাহলে বুঝবে. ওই কাপটির তলাতেই পয়সা। আর যদি দেখ, চিহ্নিত কাপটির জায়গা বদল হয়েছে. তখন যে-জায়গার কাপের সঙ্গে চিহ্নিত কাপটির জায়গা-বদল ঘটেছে সে-জায়গাটা এবং যে-জায়গায় আগে চিহ্নিত কাপটি ছিল সে-জায়গাটা—এই দুটো জায়গাই বাদ দিয়ে তৃতীয় জায়গার কাপটিকে দেখাবে। তার তলাতেই থাকবে পয়সা। থাকবেই। এই নিয়মটা শুনতে ঘটোমটো, কিন্তু হাতে-কলমে করে দেখলেই বুঝবে কী সোজা অথচ কী মজার ব্যাপার।

মজারু

আটখানা

কারাটে এখন ছোট-বড় সকলেই শিখছে। খালি হাতে. নিজেকে বাঁচাতে এবং শত্রুকে ঘায়েল করতে এর জুড়ি নেই। নিয়মিত শিখলে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। কিন্তু. সাবধান অকারণে যখন-তখন যেন কারাটে দেখাতে যেও না, ঝামেলায় পড়বে। আক্রমণের হাত থেকে কীভাবে একজন নিজেকে রক্ষা করছে তারই একটি ভঙ্গি এবারের আটখানায় দেওয়া হল, দ্যাখো।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

অসিত পাল

শুধু একবার

পিঁপড়েরা খুবই পরিশ্রমী, সদা-সর্বদা তারা কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে পিঁপড়েরা আমোদ-আহ্লাদ করে না এমন নয়। যে-কোনো ফুর্তির জায়গায় যাও, পিকনিকে. নদীর ধারে, খেলার মাঠে, দেখবে তোমার আগে থেকেই তারা সেখানে গিয়ে আসর জমিয়েছে। —জ-রা

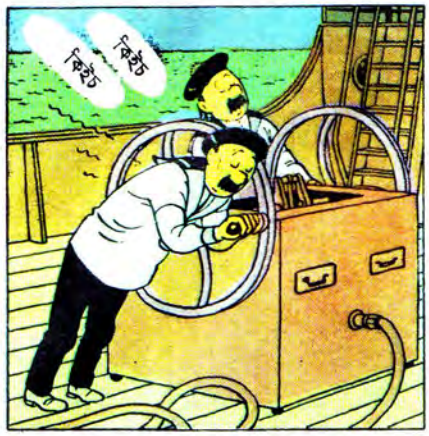

কিঁচ
কিঁচ
এ কী, এত রাত্তিরে তোমরা এখানে কী করছ?
পাম্প চালিয়ে যাচ্ছি! আপনিই তো বললেন যে, থামলে আমাদের গর্দান নেবেন!
হ্যাঁ, তা-ই তো আপনি তখন বললেন!
যাও, ঘুমিয়ে পড়ো। কাল তোমাদের ঘাম ছুটিয়ে ছাড়ব!
পরদিন সকালে...
কী জানি কেন মনে হচ্ছে যে, টিনটিন আজ গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যাবে।
আবার রাম-এর বোতল। যাক্, ক্যাপ্টেন এসে কুড়িয়ে নেবে।
দেখা যাক, কী আছে এখানে!
একটা বাক্স! কিসের বাক্স? লাল-বোম্বেটের গুপ্তধন নয় তো?
উপরে উঠে খুলে দেখব!

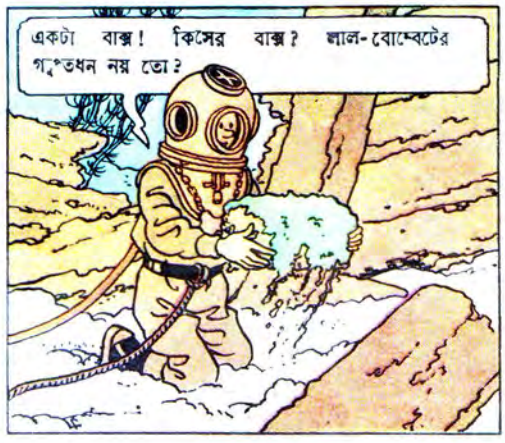

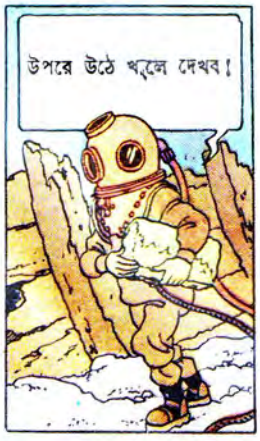

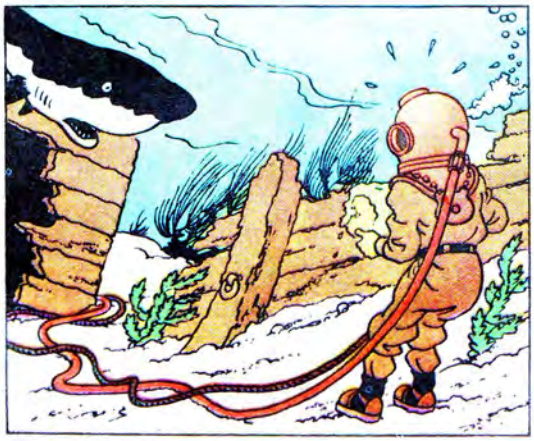

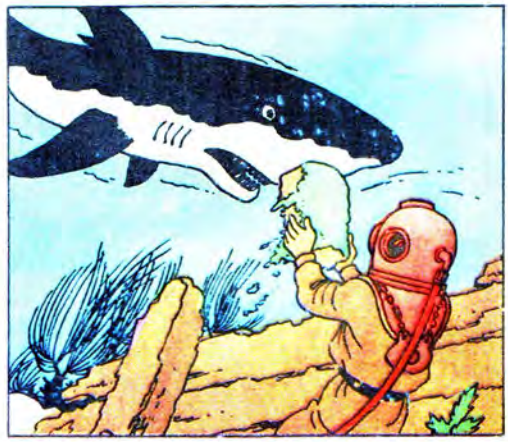

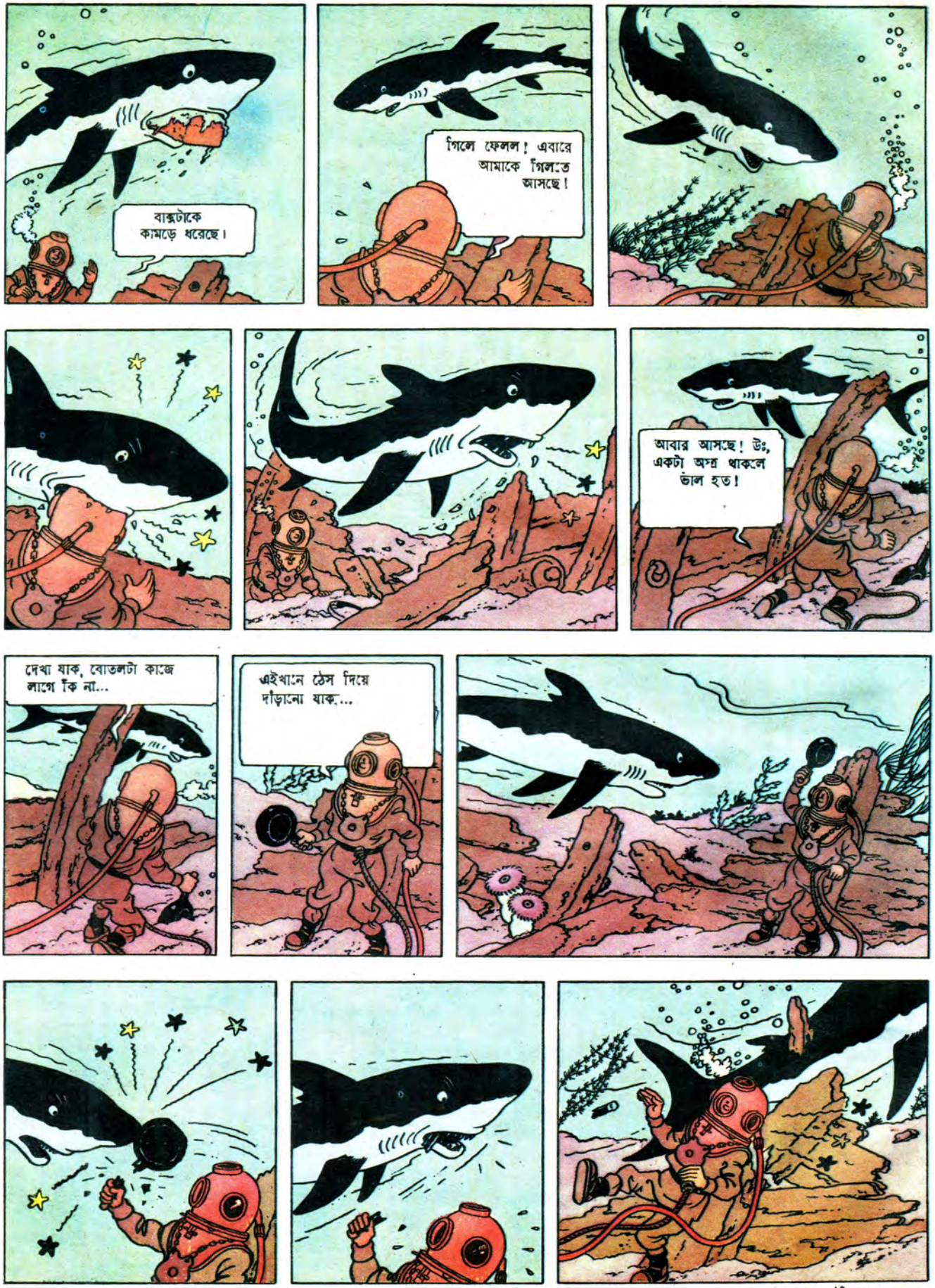

(এর পর চৌত্রিশের পাতায়)

সেণ্ট জনস ডায়োসেশান গার্লস হাইস্কুলের প্রধান-শিক্ষিকা কী বলেন

'ছোট বোন সুধা,/ডায়োসিসনের বি এ/গণিতে সে এম-এ দিবে এই তার পণ' —লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে, 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'ভীরু' কবিতায়। সত্যি এক সময় ছিল ডায়োসেশানের স্বর্ণযুগ। সেই যুগ আর নেই।

একদা সমাবর্তন উৎসবে বীণা দাশ বাংলার গভর্নরকে লক্ষ করে গুলি ছুঁড়েছিলেন। তার পরেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার ডিগ্রী বিভাগ ও বি টি বিভাগ দু'টি তুলে দেয়। এখন শুধু স্কুলই রয়েছে।

চার্চ অব নর্থ ইণ্ডিয়ার এক্তিয়ারভুক্ত স্কুলটি নানা অসুবিধার মধ্যেও অনেকখানি গুছিয়ে নিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা কুমারী জয়া সোম। ইতিহাসে এম এ। আদি নিবাস শ্রীহট্ট হলেও উনি ডায়োসেশানেরই ছাত্রী ছিলেন, এবং ১৯৬০ থেকে ওখানেই শিক্ষকতা করছেন।

ইতিহাস নিয়েই আলোচনা শুরু করি।

কুমারী সোম বললেন, "ইতিহাস একটি তথ্যনির্ভর বিষয় বলেই যেমন-তেমন করে তথ্য পরিবেষণ করলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, ইতিহাস সাহিত্য-ঘেঁষা বিষয়। কাজেই উত্তরের উপস্থাপন ভাল হওয়া চাই—অর্থাৎ, ভাল ভাষা চাই, চাই ভাল স্টাইল। আর ভাল সূচনা ও উপসংহার চাই। অবজেকটিভ প্রশ্নগুলোর জন্যে বইয়ের খুঁটিনাটি পড়তে হবে। শুধু প্রশ্নোত্তর তৈরি করলেই চলবে না। ভাল নম্বরের জন্যে বাইরের বই পড়তে হবে। সাল বাদ দিয়ে পড়বার চেষ্টা না করাই বাঞ্ছনীয়, কারণ ওটা লিখিত, মৌখিক সব পরীক্ষাতেই লাগে। পরে চাকরির জন্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেও। কারও চরিত্র আলোচনা করলে ভাল, মন্দ দু'দিকই দেখাতে হবে। সব চেয়ে বড় কথা সাবজেকটটাকে ভালবাসতে হবে।"

"যারা ভাল ফল করতে চায়, তারা তো তা বাসেই। সেদিক থেকে কথাটা সব সাবজেকট সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয় কি?"

"ঠিক তাই। সেইরকম ওই যে ডিটেলস পড়ার কথা বললাম, সেটাও। আগে রচনাধর্মী উত্তর লিখতে হত, কিন্তু বর্তমান সিলেবাস অনুসারে ছোট-ছোট অবজেকটিভ প্রশ্ন দেওয়া হয়। সেগুলোকে ট্যাকল করতে হলে টুকিটাকি অনেক পয়েনটস জানতে হচ্ছে। তাই ছেলেমেয়েদের অ্যালার্ট থাকতে হয় আগের তুলনায় অনেক বেশি।"

"ভাল ফল করতে হলে আর কী চাই?"

"উত্তর লেখা অভ্যাস করতে হবে ভালভাবে। ইংরেজি বা বাংলা যে ভাষাতেই পরীক্ষার্থী উত্তর লিখুক, সংশ্লিষ্ট ভাষায় দক্ষতা না থাকলে সে উদ্দেশ্য সফল হবে না। আর তা ছাড়া, ভাল ছেলেমেয়েরা, স্কুলে যে-সব বই পড়ানো হয় তার বাইরে বই পড়বে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেক সাবজেকটে অন্তত স্কুলের বইখানা মন দিয়ে পড়া উচিত।"

ইংরেজির প্রসঙ্গে বললেন, "শব্দ-ভাণ্ডার বাড়াতে হবে। ভাল ভাল ইংরেজি বই পড়তে হবে। যত পড়া যাবে, লেখার মান তত উন্নত হবে। ইংরেজি কনস্ট্রাকশনের দিকে জোর দিতে হবে—ছোট ক্লাস থেকেই।"

বাংলা সম্পর্কে সহকারী শিক্ষিকা শ্রীমতী নীলিমা পাইন বললেন, "পাঠ্যাংশ ভাল করে পড়তে তো হবেই। তার উপর মূল বইগুলি, অর্থাৎ যে-সব বই থেকে পাঠ্যাংশগুলি চয়ন করা হয়েছে, সেগুলি পড়ে নিলে টেক্সট বুঝতে সাহায্য হবে। এগুলি ছাড়াও বাইরের বই পড়া চাই। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরগুলি লিখে অভ্যাস করতে হবে। ব্যাকরণ বুঝতে হবে, শুধু মুখস্থ করলে চলবে না। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শতকরা দু'জন ব্যাকরণ জানার মতো জানে কিনা সন্দেহ।"

শ্রীমতী পাইন সংস্কৃতও পড়ান। বললেন, টেক্সট ভাল করে পড়া দরকার। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী টেক্সট না পড়েই একেবারে নোটবই পড়ে। টেক্সট ভালভাবে পড়লে দেবনাগরী হরফ ভালভাবে চেনা যায় যেটা খুবই দরকার। শব্দরূপ, ধাতুরূপ ভাল করে পড়া দরকার। টেক্সট-এর প্রশ্নের মধ্যে কম্প্রিহেনশান টেস্ট জাতীয় প্রশ্নটির উত্তর ভালভাবে লিখতে পারলে পুরো নম্বর পাওয়া যায়।"

আলোচনার মধ্যে একসময় যোগ দিলেন মিস কল্পনা ভঞ্জ। বিষয় অঙ্ক। অঙ্ক বারবার অভ্যাস করার কথা বললেন। বললেন, অঙ্ক-ভীতি কাটিয়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তার কথা।

বিজ্ঞান বিষয়গুলি সম্পর্কে বললেন, "প্রশ্ন বুঝে নিজের ভাষায় ব্রিফ অ্যাণ্ড টু দা পয়েন্ট উত্তর লিখতে হবে।" এর জন্যে ধারণা পরিষ্কার থাকা দরকার, প্রকাশভঙ্গির সৌষ্ঠব চাই।

ভূগোল সম্পর্কে ও'দের বক্তব্য : তথ্য চাই, ভাষাও চাই। প্রথমটি মনে রাখতে হবে, দ্বিতীয়টি অভ্যাস-সাপেক্ষ। ম্যাপ, স্কেচ ইত্যাদি পরিষ্কার করে আঁকার কথাও বললেন।

কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

ডায়োসেশানে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল স্বাতী মুখোপাধ্যায়।

মৌসুমী দেব আর মৈত্রেয়ী গঙ্গোপাধ্যায়ও স্বাতীর মতই ফার্স্ট। ওরা অন্য দুটি সেকশান থেকে উঠেছে। তবে তিন সেকশানের মধ্যে স্বাতীর নম্বরই সবচেয়ে বেশি ছিল।

স্বাতী রোজ সকালে তিন ঘণ্টা আর রাতে চার ঘণ্টা পড়াশোনা করে। ছুটির দিনগুলোয় দুপুরেও পড়ে। কীভাবে? ইংরেজিতে টেক্সট-বইয়ের প্রত্যেকটা পিস খুব মন দিয়ে পড়ে নেয়; তারপর বিশেষ-বিশেষ শব্দের অ্যান্টোনিম-সিনোনিম-হোমোনিম তৈরি করে। এর জন্যে ও বাবার কথামতো একটা রোজেটস থেসারাস ব্যবহার করছে।

বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে স্বাতী প্রতিটি অধ্যায়ের প্রতিটি লাইন পড়ে। তারপর দেখে ঐ অধ্যায় থেকে কতরকম প্রশ্ন হতে পারে। অঙ্কে স্বাতী কেশব নাগের বইগুলি আর একটি 'সিওর সাকসেস' ব্যবহার করে। ফিজিক্যাল সায়েন্সে স্কুলের বই সি আর দাশগুপ্ত অ্যান্ড এস এস ব্যানার্জী। (হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি. ও ইংরেজি মিডিয়ামেই পড়াশোনা করে—ওদের স্কুলে সেভেন থেকে ইংরেজি মিডিয়াম।) স্বাতী ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির জন্যে অতিরিক্ত বই পড়ে—রায়চৌধুরী অ্যান্ড সিনহা এবং পি কে দত্ত। আর দুয়ের জন্যেই একটি করে প্রশ্নোত্তরের বই। লাইফ সায়েন্সে স্কুলের বই পাল-দেব-এর সঙ্গে সঙ্গে দাশ-মুখার্জি। ইতিহাসে বোস-মাইতি আর ডঃ এ সি ব্যানার্জির আউটলাইন অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি। ভূগোলে এস কে ভট্টাচার্য আর একটি প্রশ্নোত্তরের বই। সংস্কৃতে হরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ব্যাকরণকৌমুদী ছাড়াও হৃষীকেশ শাস্ত্রী সম্পাদিত পাণিনিসূত্রম এবং বিখ্যাত হেল্পস টু দা স্টাডি। সংস্কৃতই ওর সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। অ্যাডিশনালও নিয়েছে সংস্কৃত। অথচ ওর পড়ার ইচ্ছে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে।

"এটা কি তোমার বাবার প্রভাব?"

স্বাতী হেসে জানাল, "অনেকটা তাই। আমার দিদিও ইংরেজিতে এম-এ।"

মাসিক আনন্দমেলা বলতে স্বাতী অজ্ঞান। আনন্দমেলার উপন্যাসগুলির আকর্ষণ ওর কাছে দুর্নিবার। লেখাপড়া বিভাগ তো আছেই। বাইরের উপন্যাসও ও পড়ে। একটু বেশি পড়ে। প্রবন্ধ লেখার দিকে ঝোঁক আছে। "রবীন্দ্রনাথের কিশোর-চরিত্র" নিয়ে লিখছে।

স্বাতী গান ভালবাসে খুব। গীতবিতানের রবীন্দ্রসঙ্গীতে তৃতীয় বর্ষের এই ছাত্রীটি গান এতই ভালবাসে যে, পরীক্ষার বছরটাও গান শেখা বন্ধ রাখতে নারাজ।

খেলাধুলোয় খুব একটা আগ্রহ নেই স্বাতীর। তবে ওর ভাল লাগে ব্যাডমিণ্টন তারপর ক্রিকেট। ফুটবল তেমন নয়। তবে একটি দলের খেলা সম্পর্কে ও মোটেই উদাসীন নয়। কোন্ দল? একগাল হেসে ও বলে উঠল, "মোহনবাগান"।

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

যারা কচি কাঁচা তাদের ত্বকের

নিরাপত্তার জন্য চাই

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

ছোটদের নিয়ে মেলাই ঝক্কি ঝামেলা। আর এক দুর্ভাবনা তাদের কোমল ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষা। জীবাণু সংক্রমণের ভয় তাদের ক্ষেত্রেই বেশি। মায়েদের সব ভাবনা থেকে ছুটি দিল বোরোলীন। কাটা ছেঁড়া ফাটায় অনবদ্য। রুক্ষ, শুষ্ক কিংবা ঝলসানো ত্বকেও অদ্ভুত কাজ করে

বোরোলীন

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড • বোরোলীন হাউস • কলিকাতা-৭০০ ০০৩

(একত্রিশের পাতার পর)

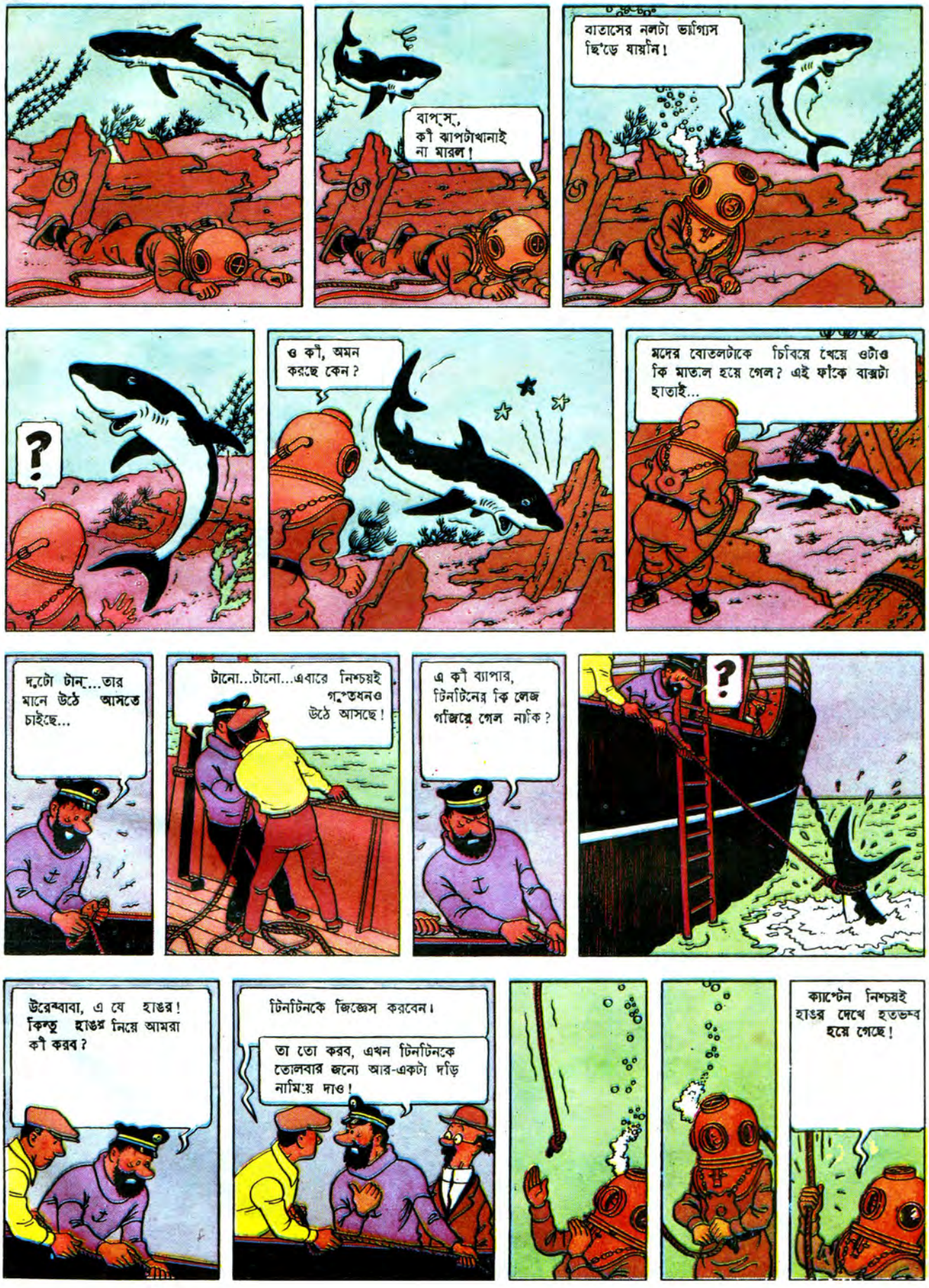

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

রাঙিয়ে দিয়ে যাও কুন্তক

জানিস দাদা, আমাদের ক্লাসে দুজন মহুয়া আছে।

জানিস টুম্পি, আমাদের ক্লাসে দুজন রণজিৎ আছে।

ফাজলামি, না?

ফাজলামির কী হল? থাকতে পারে না ও-রকম? তোদের থাকতে পারে আর আমাদের পারে না?

আমরা কী করি জানো? দুজনকে তাই পুরো নাম ধরে ডাকি। একজনকে বলি মহুয়া রায়, আরেকজনকে বলি মহুয়া সেন। তোমরা কী করো?

আমরা? আমরা একজনকে বলি রণজিৎ, আরেকজনকে বলি রণ্‌জিৎ। মানে, একজনকে অ দিয়ে, একজনকে হসন্ত দিয়ে। সহজ না আমাদেরটা?

লেখার থেকে মুখ তুলে আমাকে তখন বলতে হল: হ্যাঁরে নন্তু, তোর বন্ধুরা কেউ আপত্তি করে না ওতে?

না তো! আপত্তি কেন করবে?

তাহলে মোটেই ওদের এক নাম নয়।

ভারী জানো তুমি।

জানি বলেই তো সন্দেহ হচ্ছে। তুই এখনো টের পাসনি যে, ওদের একজন হল রঞ্জিত, আরেকজন রণজিৎ। উচ্চারণে তফাত একটুখানি, ওই যেমন তুই বললি। কিন্তু শব্দ দুটো যে একেবারে আলাদা। এই দেখ্, লিখে দেখাচ্ছি।

লিখে দেখাতেই নন্তু বলল: একটা খণ্ড ত, আরেকটায় পুরো ত লিখলে কেন? আমরা তো তা লিখি না।

তোমরা কী লেখো সে তো বড়ো কথা নয়। তোমার বন্ধু দুটি কী লেখে, সেইটে একবার দেখে নিয়ো তো।

টুম্পি জিজ্ঞেস করল: কাকু, জিৎ দিয়ে যে-সব শব্দ, তাতে তো খণ্ড ত-ই হয়? হয় না, বলো?

যেমন? সে-রকম শব্দ কিছু মনে পড়ছে তোর?

সেরকম? যেমন ধরো—যেমন ধরো—ইন্দ্রজিৎ। কী বানান, ইন্দ্রজিৎ?

ঠিকই ভেবেছিস, ওটা খণ্ড ত-ই বটে। নিশ্চয়ই ও-রকম আরো ভাবতে পারবি। বিশ্বজিৎ প্রসেনজিৎ। এ শব্দগুলির মানে বলতে পারিস তো? ইন্দ্রজিৎ কার নাম?

রাবণের ছেলে।

কেন ওই নাম জানিস তো? ইন্দ্রকে জয় করেছেন যিনি তিনি ইন্দ্রজিৎ। যুদ্ধে জিতেছেন যিনি তিনি রণজিৎ বা সমরজিৎ। এইরকমই বিশ্বজিৎ বা প্রসেনজিৎ। বিশ্বকে বা প্রসেনকে ...

প্রসেন আবার কে?

রাজা ছিলেন একজন। এসব জায়গায় তো দেখছিস গোটা-একটা শব্দের সঙ্গে বসেছে ঐ জিৎ। আবার, উপসর্গের সঙ্গেও বসতে পারে এ-রকম। মনে আছে তো উপসর্গ?

আছে আছে। অত বোকা ভেবো না।

বেশ কথা। সম্পূর্ণভাবে, সম্যক্‌ভাবে জয় করেছেন যিনি তিনি সঞ্জিৎ। সম্ আর জিৎ। তেমনি অভিজিৎ। এই তো? কিন্তু হেরে গেলে কী হবে বল্ তো?

হেরে গেলে? পরাজিত।

ঠিক। তখন আর জিৎ নয়, জিত। তখন এল ত প্রত্যয়। পরাজিত, বিজিত, নির্জিত, সুজিত। জেতা যায়নি যাকে? অজিত।

নন্তু একটু ভেবে বলল: সম্পূর্ণ জয় করেছেন যিনি তিনি সঞ্জিৎ। ঠিক আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ জিতে নেওয়া হল যাকে, তিনি কেন সঞ্জিত হতে পারবেন না?

বাঃ, নন্তু, চমৎকার বলেছিস। পারবে না কেন, নিশ্চয় পারবে। দুটোর দুই মানে হল, এই যা তফাত। দুটো আলাদা শব্দ হয়ে গেল।

ও, সেইরকম তুমি বলছ রণজিৎ আর রঞ্জিত?

না মশাই, সেইরকম বলছি না। এখানে আর সে-রকম হচ্ছে না। ইচ্ছে করলে যে রণজিত বলে কোনো শব্দ বানানো যায় না তা নয়। যুদ্ধে জিতে নেওয়া হয়েছে যাকে, এইরকম একটা মানে করা যায়। কিন্তু রঞ্জিতের সঙ্গে রণের যে কোনো সম্পর্কই নেই রে বাপু। এ বেশ শান্তিপ্রিয় লোক।

কোত্থেকে এলেন ইনি কাকু? এই শান্তিপ্রিয় লোকটি?

যেখান থেকে এসেছেন রঞ্জন, সেইখান থেকে। নন্দন নন্দিত যেমন, বন্দন বন্দিত যেমন, গুঞ্জন গুঞ্জিত যেমন, ঠিক তেমনি রঞ্জন রঞ্জিত। রাঙিয়ে দিয়ে যাও, যাও যাও গো এবার। হবে না কি গানটা?

দাঁড়াও দাঁড়াও, গানের আগে একটা কথা। যুদ্ধের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে কিন্তু রঞ্জিতের।

কী রকম?

রক্তে রাঙিয়ে দেয় যদি? রক্তরঞ্জিত?

ও বাবা, এ যে ভীষণ কথা বললি তুই। ঠিক, হতেই তো পারে। কিন্তু তুই না কাব্যবিশারদ? তার চেয়ে কি অনেক ভাল নয় এইটে মনে রাখা:

এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত
এই তোমারি মিলনসুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।

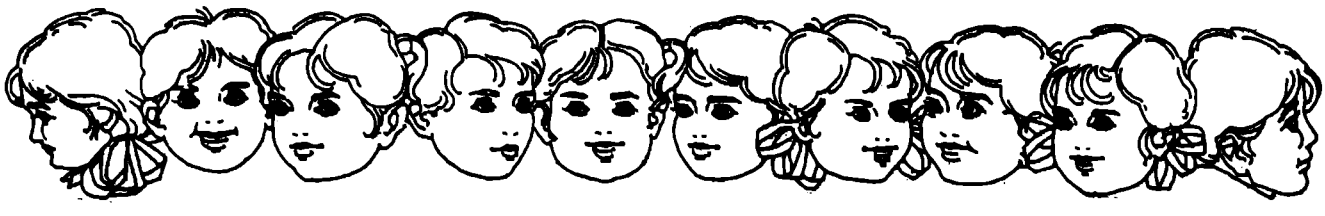

কোন্ কথাটি কার

চামেলিরা সবাই যে-যার নিজের সম্বন্ধে কয়েকটি করে বাক্য বলল, মনে আছে তো? এবার তাদের মধ্যে তিনজনের একটি করে বাক্য নীচে দিয়ে দিলাম। বলো তো, কোন্ কথাটি কার?

1) I love Araballi.
2) I play football.
3) I treat patients.

শ্রাবণ মাসের আনন্দমেলায় বলেছিলাম এরা কে কী করছে। সেখানে এই বাক্যগুলো ছিল:

1) Mr. Roy is sitting on a chair.
2) Mr. Roy is standing near the window.
3) Araballi is waiting for her saucer of milk.

প্রথম তিনটে বাক্যের সঙ্গে তার পরের তিনটে বাক্যের একটা তফাত নিশ্চয় তোমাদের চোখে পড়েছে। তফাতটা আরও পরিষ্কার বুঝতে পারবে যদি নীচের বাক্য দুটো লক্ষ করঃ

(a) I play football.
(b) I am playing football.

কিংবা দ্যাখো:

(c) I love Araballi.
(d) I am playing with Araballi.

আবার লক্ষ করো:

(e) I treat patients.
(f) I am standing at the window.

চম্বল ফুটবল খেলে, কিন্তু এখন খেলছে না. এখন খাওয়া-দাওয়া করছে। কাজেই প্রথম বাক্য-জোড়ার মধ্যে একটা তার বেলায় খাটে, আরেকটা খাটে না। কোন্‌টা খাটে, কোন্‌টা খাটে না?

তেমনি, চামেলিও এখন খাচ্ছে। তার বেলায় দ্বিতীয় বাক্য-জোড়ার কোন্‌টা খাটে, কোন্‌টা খাটে না, বলো তো?

কিন্তু চামেলির বাবার বেলায় তৃতীয় বাক্য-জোড়ার দুটোই খাটে। কেন, বলতে পারো?

এখন, খাবার ঘরে চামেলির মা-বাবার মধ্যে এই রকম কথাবার্তা হল —

Mr Roy: You are not eating.

Mrs. Roy: No, I'm (I am) reading this letter.

Mr. Roy: Your breakfast is getting cold.

এখন তুমি আনন্দমেলা পড়ছ। তোমার বাবা এখন কী করছেন? মা কী করছেন? বাড়ির আর সবাই কে কী করছে, লেখো।

প্রসাদ

স্কট

কুক

পিয়ারি

ক্যাপ্টেন কুক, পিয়ারি

বিভিন্ন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হলে ধনরত্ন, মশলাপাতি ইত্যাদি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু মেরু-অভিযানে সেরকম কোনো সম্ভাবনা নেই। কিছু পাওয়ার আশা না নিয়েই অভিযাত্রীরা প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে মেরু অভিযানে গেছেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম পথ আবিষ্কার করে মশলা দ্বীপে যাওয়ার জন্য অনেক অভিযান চালানো হয়েছিল। ১৭২৮ সালে বেরিং প্রণালী আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজরা আবার উত্তর মেরুর পথে মশলা দ্বীপে যাওয়ার জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ক্যাপ্টেন কুককে তাঁর তৃতীয় অভিযানে উত্তর-পশ্চিম দিকের জলপথ খুঁজতে বলা হয়েছিল। তিনি বেরিং প্রণালী পার হয়ে আরও উত্তরে গিয়েছিলেন। নেপোলিয়ানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে অনেক ইংরেজ নৌ-অফিসার উত্তর মেরু অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। এঁদের মধ্যে ফরবিশার, ডেভিস, হাডসান ও বেফিনের নাম উল্লেখযোগ্য। জন রস ও প্যারিও অনেক অভিযান চালিয়েছিলেন। দ্বিতীয় অভিযানে তিনি চৌম্বকীয় মেরুতে ব্রিটিশ পতাকা পুঁতে রেখে এসেছিলেন। ফ্রাংকলিন উত্তর মেরু অঞ্চলে অনেকগুলো অভিযান চালিয়েছিলেন। একটি অভিযানে তাঁদের দলের সকলেরই মৃত্যু হয়। ১৮৯৩ সালে নানসেন একটি অভিযান চালালেন। তিনি এস্কিমোদের তৈরি নৌকো ও স্লেজের সাহায্যে উত্তর মেরুর কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছিলেন। তাঁর অভিযানে এই কথা প্রমাণিত হয়েছিল যে, উত্তর মেরু-বিন্দু আছে একটি গভীর সমুদ্রের মধ্যে—যার ওপরটা একটা পুরু বরফের চাদরে ঢাকা।

উত্তর মেরু জয়ের দাবিদার দুজনের নাম ডাক্তার কুক্ ও পিয়ারি। ডাক্তার কুকের উত্তর মেরু জয়ের দাবি মেনে নেওয়া হয়নি। পিয়ারির জন্ম হয়েছিল ১৮৫৮ সালে উত্তর আমেরিকায়। পিয়ারি উত্তর মেরু অভিযানের জন্য অনেক দিন থেকেই তৈরি হচ্ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, উত্তর মেরু জয় করতে হলে এস্কিমোদের সাহায্য নেওয়া খুবই দরকার। কীভাবে তারা মাছ ধরে, কীভাবে তারা শিকার করে, কীভাবে তারা বেঁচে থাকে—জানা দরকার। জানা দরকার, তাদের ভাষা ও আচার-ব্যবহার। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বও করতে হবে। ১৯০৮ সালে উত্তরে যাওয়ার সময় তিনি বেশ কয়েকজন এস্কিমো ও ২৫০টি কুকুর সঙ্গে নিলেন। ১৯০৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি পায়ে হেঁটে উত্তর মেরুর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তুলনামূলক বিচারে উত্তর মেরুর আবহাওয়া তখন খুবই ভাল ছিল। একজন এস্কিমো তো বলেই ফেলল যে, দৈত্যটা বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই আবহাওয়া এত ভাল। শেষ যাত্রায় পিয়ারি চারজন এস্কিমো ও একজন কালো মানুষকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। ১৯০৯ সালের ৬ এপ্রিল পিয়ারি উত্তর মেরুতে পৌঁছলেন। পিয়ারির উত্তর মেরু জয়ের খবর বেতারে ইংলণ্ডে এসে পৌঁছয়। ১৯১০ সালের মে মাসে পিয়ারি যখন ইংল্যাণ্ডে এলেন তখন তাঁকে একটি বিশেষ সভায় সম্বর্ধনা জানানো হয়।

ভুল শুধরে নাও। গতবারে ভুল করে ক্যাপ্টেন স্কটের বদলে কমাণ্ডার পিয়ারির ছবি ছাপা হয়েছিল।

দিদিমণি

উপন্যাস

অলৌকিক

বিমল কর

আগে যা ঘটেছে

বরদা একটা ভূতুড়ে ছবি দেখতে সিনেমায় গিয়েছিল। ছবি দেখতে গিয়ে অদ্ভুত ধরনের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। ভদ্রলোকের নাম সিদ্ধেশ্বর। ওঁর কাজ হল মানুষ নিয়ে গবেষণা। সাধারণ মানুষ নয়, এমন সব মানুষ, যাদের মধ্যে অস্বাভাবিক অলৌকিক কোনো গুণ রয়েছে। দুমকার কাছে সেই গবেষণা-কেন্দ্র।

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে নিয়ে এলেন দুমকার সেই রিসার্চ সেন্টারে। সেখানে মহাদেব বলে একটা লোক জুটেছিল, যার সঙ্গে বরদার চেহারার খুব মিল। সিদ্ধেশ্বর মহাদেবকে বিশ্বাস করতেন না। মহাদেবকে তিনি শয়তান বলে মনে করতেন। মহাদেবের উদ্দেশ্য এই রিসার্চ সেন্টার থেকে দু-চার জনকে বাইরে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে টাকাপয়সা কামানো, মানুষকে ঠকানো। সিদ্ধেশ্বর মহাদেবকে জব্দ করতে চাইছিলেন। কিন্তু বরদাকে আনার পর নিজেই জব্দ হয়ে গেলেন। তাঁর প্রায় চোখের সামনেই এক টাঙাওয়ালা খুন হয়ে গেল। সিদ্ধেশ্বর সন্দেহ করলেন, সুজন বলে একটা লোক, যার গায়ে অসুরের মতন ক্ষমতা, সে মহাদেবের প্ররোচনায় খুন করেছে টাঙাওয়ালাকে। সন্দেহ করলেন বটে, কিন্তু সুজন কোথায়?

সুজনের খোঁজ চলতে লাগল। কিন্তু এরই মধ্যে মহাদেব এসে বরদাকে শাসিয়ে গেল। বলে গেল, দিন তিনেকের মধ্যে বরদা যদি কলকাতায় ফিরে না যায়, তবে তার অবস্থাও টাঙাওলার মতন হতে পারে।

ইতিমধ্যে আবার বরদার ঘরে ঢুকে কেউ তার সুটকেস খুলেছিল। খুলে জামাকাপড় কিছু নেয়নি অবশ্য, কিন্তু অদ্ভুত এক কাজ করেছে। সুটকেস থেকে বরদার নতুন মোজা বার করে তার জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছে। আর পুরনো মোজাজোড়া জুতো থেকে বার করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। সিদ্ধেশ্বর বললেন, এটা সুজনের জন্যেই করা হয়েছে। মহাদেবই করেছে। সুজন জামা-কাপড়ের গন্ধ শুঁকে তার মালিককে আক্রমণ করতে পারে। বরদা বড় ভয় পেয়ে গেল। সে আর থাকতে চাইল না। জেদ ধরল, তাকে কলকাতায় ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কলকাতা ফেরার ব্যবস্থা করে দিলেন সিদ্ধেশ্বর বরদার। সতীশ ডাক্তারের মোটরবাইকের পেছনে চড়ে সন্ধেবেলায় তাকে রামপুরহাট স্টেশনে আসতে হবে। বরদা সেইভাবেই আসছিল। হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি গেল খারাপ হয়ে। আর আলপাশ থেকে কে যেন এসে হাজির হল। তারপর—

১৫

মহাদেব।

যার হাত থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল বরদা, সেই শয়তান মহাদেবই চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে এল বরদার। ভয়ে কেমন অদ্ভুত শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সতীশ। হাতের টর্চ ফেলল মহাদেবের মুখে। জোরালো আলো।

আলো মুখে পড়তেই মহাদেব বোধহয় বিরক্ত হল। চোখের পাতা বুজল। মাথা নাড়ল।

মহাদেবের সামান্য পিছনে সিদ্ধেশ্বর। আগে তাঁকে দেখা যায়নি, খেয়ালও করেনি বরদা। সিদ্ধেশ্বরকে দেখে যে ভয় গেল তাও নয়, তবু একটু বুঝি সাহস হল।

সিদ্ধেশ্বর বড়-বড় পা ফেলে একেবারে মহাদেবের পিঠের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পোশাকটা অদ্ভুত। কালো প্যান্ট, কালচে শার্ট। গায়ের সঙ্গে পোশাকটা লেপটে রয়েছে।

বরদার গলা উঠছিল না। বুক ধকধক করছে। বলল, "আপনি?"

সিদ্ধেশ্বর ঠাট্টার গলা করে বললেন, "কাছাকাছি থাকব বলেছিলাম।" বলে মহাদেবের দিকে ইশারা করে দেখালেন। "ওকে একটু ভাল করে দেখুন তো! কী মনে হচ্ছে?"

বরদা নজর করে দেখল। কয়েক মুহূর্ত দেখার পর তার গলা দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল। মহাদেবের পরনে বরদার প্যান্ট, বরদার শার্ট, বরদার মতনই দেখাচ্ছে তাকে। আচমকা দেখলে বরদারই যেন মনে হত, সে ভূত দেখছে।

"আমার প্যান্ট, জামা...।"

"আপনার মতনই দেখাচ্ছে না?"

ঘাড় নাড়ল বরদা। দেখাচ্ছে। বলল, "প্যান্ট-জামাও চুরি করেছিল?"

"না। করেনি। আমরা করেছি। সুটকেস থেকে।"

কথাটা ধরতে পারল না বরদা প্রথমে। তারপর বুঝতে পারল। সিদ্ধেশ্বর আগেভাগেই সুটকেস নিয়ে নিয়েছিলেন বরদার, বলেছিলেন গোপালকে দিয়ে স্টেশনে পাঠিয়ে দেবেন। বরদা এবার বুঝতে পারল, সিদ্ধেশ্বর ধোঁকা দিয়েছিলেন বরদাকে, ধোঁকা দিয়ে সুটকেসটা হাতিয়ে নিয়েছিলেন। সেই সুটকেস থেকে প্যান্ট-শার্ট বার করে মহাদেবকে দিয়েছেন পরতে। কিন্তু কেন?

মহাদেব চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, তার নিজের যেন চেতনা নেই। আচ্ছন্নের মতন হয়ে আছে। চোখের পাতা আধ-বোজা, ঘুম-ঘুম ভাব। সামান্য দুলছে। মুখে কথা নেই। বরদাদের দেখছে, কিন্তু খেয়াল নেই।

বরদা বলল, "কী হয়েছে ওর?"

সিদ্ধেশ্বর বাঁকা করে হাসলেন, "ওষুধের গুণ।"

"কী ওষুধ?"

সিদ্ধেশ্বর সতীশকে দেখিয়ে দিলেন। "ডাক্তার জানে।"

সতীশ দু পা এগিয়ে গিয়ে মহাদেবের চোখ-মুখ দেখল আবার। মহাদেব আবার বিরক্ত হল। আলো যেন সহ্য করতে পারছিল না।

সতীশ সিদ্ধেশ্বরকে বলল, "আরও ঘণ্টা খানেক থাকতে পারে। তারপর আর ইনজেকশনের এফেক্ট থাকবে না।"

বরদা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সিদ্ধেশ্বর বললেন, "তা হলে আর দেরি করে লাভ নেই। তুমি এদিকে একটু চক্কর মেরে দেখো।"

টর্চটা নিবিয়ে ফেলল সতীশ। নিবিয়ে বরদার হাতে দিল। বলল, "ধরুন।"

বরদা টর্চটা হাতে নিল।

সতীশ মোটর-বাইকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, সিদ্ধেশ্বর বললেন, "বাতি জ্বেলো না। জ্যোৎস্না রয়েছে। এদিকে ধীরে ধীরে বার কয়েক চক্কর মারতে পারবে না?"

সতীশ জ্যোৎস্নার আলো দেখল। বলল, "পারব বোধহয়।"

"দরকার পড়লে গাড়ির আলো জ্বেলে নিও। না-জ্বালানোই ভাল।"

সতীশ কেমন অক্লেশে স্টার্ট দিল গাড়িতে। বরদা বুঝতে পারল না, যে-গাড়ি বিকল হয়ে রাস্তায় পড়ে ছিল এতক্ষণ, সেটা এখন কেমন করে ঠিক হয়ে গেল? এটাও কি ধোঁকা?

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সতীশ বলল, "কতটা চক্কর মারব, সিধুদা?"

"ক-তটা আর। সিকি মাইলটাক। আমার মনে হয় সুজন এরই কাছাকাছি কোথাও রয়েছে।"

সতীশ বিশ-পঁচিশ গজ এগিয়ে গিয়ে গাড়ির মুখ ঘোরাল।

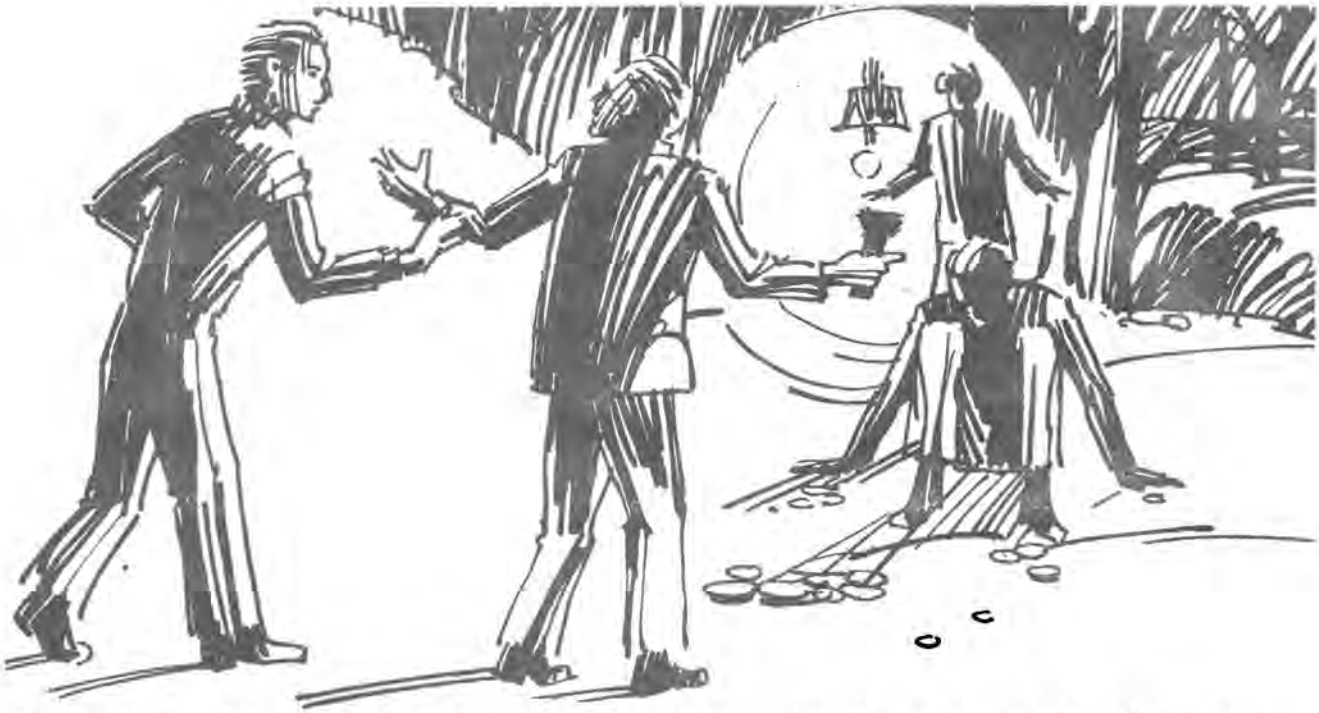

ঘুরিয়ে পলাশ বনের দিকে আবার ফিরে চলল, ধীরে-ধীরে, মোটর-বাইকের শব্দটা এই ফাঁকায় ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

মহাদেব যেন আর দাঁড়াতে পারছিল না। জড়ানো শব্দ করল। টলে গেল। তারপর বসে পড়ল রাস্তায়। সিদ্ধেশ্বরের পায়ের কাছে। সিদ্ধেশ্বর দু পা পিছিয়ে গেলেন।

বরদার আর ধৈর্য থাকছিল না। তাকে আর কত অবাক করবেন সিদ্ধেশ্বর। পরপর এত কান্ড কেন? মনে মনে কী ভেবে রেখেছেন সিদ্ধেশ্বর? বরদার আড়ালে সতীশের সঙ্গে কোনো মতলব এঁটেছেন তিনি?

বরদা বলল, "আপনি আমায় কলকাতায় পাঠাবার নাম করে এ-সব কী করছেন আমি বুঝতে পারছি না। মহাদেব কোথা থেকে এল? আপনি সুজনকেই বা কেন খুঁজছেন? তার মতন লোককে এই অবস্থায় যেচে কেউ ডাকে?"

সিদ্ধেশ্বর চারপাশ তাকালেন। দেখলেন। বললেন, "আজ আপনার কলকাতা ফেরা হবে না।"

অবাক হল না বরদা। বলল, "আপনি আমাকে কলকাতা পাঠাবার নাম করে অন্য মতলব ঠাউরেছেন।"

"হ্যাঁ।"

"আমায় বলেননি কেন?"

"বললে আপনি রাজি হতেন না। ভয় পেতেন।" বলে মহাদেবের দিকে ইশারা করলেন, "ওর সঙ্গেও একটু চালাকি করলাম।"

"মানে?"

"আপনি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন এটা জানার পর মহাদেব কি চুপ করে বসে থাকবে? কী মনে করেন আপনি মহাদেবকে? ও কি মিথ্যে-মিথ্যে আপনার পুরনো মোজা চুরি করেছিল?" বলে মহাদেবের দিকে তাকালেন। "সুজনকে ও তৈরি করে রেখেছে। তাই না মহাদেব?"

মহাদেব মাঠের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। মাথা টলে পড়েছে বুকের কাছে। তার কোনো হুঁশ নেই।

সিদ্ধেশ্বর একবার টর্চটা জ্বালতে বললেন বরদাকে, জ্বেলে মহাদেবের মুখের ওপর ফেলতে বললেন।

বরদা টর্চ জ্বালল। মহাদেবের মুখে ফেলল। মনে হল, মহাদেব আর-একটু পরেই হয়ত মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

সিদ্ধেশ্বর টর্চ নেবাতে বললেন। বরদা টর্চ নেবাল।

জ্যোৎস্না যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চারদিক ফাঁকা, ঝিমঝিম করছে জ্যোৎস্না, পলাশ বনের দিক থেকে মোটর-বাইকের শব্দ ভেসে আসছে, শীতের কুয়াশা জমছে হাল্কা, গাছপালার গায়ে ছায়া আর চাঁদের আলো জড়ানো।

বরদা বলল, "আপনি আমায় কলকাতা পাঠাবার নাম করে এ-সব কেন করলেন? আমি বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে চাইনি।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমার কপাল খারাপ বরদাবাবু, আগে বুঝতে পারিনি এ-রকম একটা ঝঞ্ঝাটে আমাকেও পড়তে হবে।... ও কথা থাক, আজ আপনি কলকাতায় ফিরে যেতে চাইলেও পারতেন না। মহাদেব আপনাকে ছাড়ত না।"

"কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন—?"

"যা বলেছিলাম ভুলে যান। আপনি ভয় পেয়েছিলেন বলে ভরসা দিয়েছিলাম। কিন্তু এটা আপনি নিশ্চয় করে জানবেন, মহাদেব আপনাকে ছাড়ত না। আজও নয়। সুজনকে আপনার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে।"

বরদা চারদিকে তাকাল। যেন সুজন কোথাও আছে কিনা দেখল। বলল, "কেন? আমি তো ফিরেই যাচ্ছিলাম। মহাদেব আমায় কলকাতায় ফিরে যেতে বলেছিল। সময় দিয়েছিল তিন দিন। জিজ্ঞেস করুন। আমার একদিন দেরি হয়ে গিয়েছে এই যা।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "যে-লোক নিরীহ একজন টাঙাঅলাকে অকারণে পিশাচের মতন খুন করায়, তার কথা আপনি বিশ্বাস করেন ও আপনাকেও টাঙাঅলার মতন খুন করত। করবে ভেবেছিল। তার ব্যবস্থাও করে রেখেছে। আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন, দেখতেই পাবেন।"

বরদার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আবার। তাকাল মহাদেবের দিকে। না, মাটিতে লুটিয়ে পড়েনি মহাদেব, দু-হাত দু-পাশে রেখে বসে আছে। লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় না। মহাদেবের পক্ষে সবই সম্ভব।

ঘৃণা হল বরদার। শয়তানটা কী অক্লেশে বেচারা টাঙাঅলাকে

খুন করিয়েছে। নিরীহ, নির্দোষ, হতভাগ্য টাঙাঅলা! টাঙাঅলার তুলনায় বরদা তো মহাদেবের ঘৃণার পাত্র, শত্রু। কেননা বরদাকে কলকাতা থেকে সিদ্ধেশ্বর নিয়ে এসেছিলেন মহাদেবকে শায়েস্তা করতে।

"ও কথা বলছে না কেন?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

"কথা বলার অবস্থায় নেই।"

"কেন?"

"ওর কোনো বোধ নেই। কিছু বুঝতে পারছে না।"

বরদার কানে মোটর-বাইকের শব্দটা অদ্ভুত লাগছিল। সতীশ অনেক কাছে এসে গিয়েছে। তবু দেখা যাচ্ছে না, গাছ-পালার ছায়ার সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে সতীশ আর তার মোটর-বাইক।

"মহাদেবকে আপনারা না ওষুধ খাওয়াবার কথা বলছিলেন?" বরদা বলল।

"ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল। তারপর আজ ইনজেকশানও করা হয়েছে।"

"কখন?"

"বিকেলে। সতীশ করেছে।"

"কী ইনজেকশান?"

"আমি ঠিক জানি না। সতীশ জানে।"

"ওকে আপনি নিয়ে এলেন কেমন করে এতটা রাস্তা?"

"গরুর গাড়ি করে।"

বরদা অবাক হয়ে বলল, "গরুর গাড়ি? কোথায় গরুর গাড়ি? আমি তো দেখিনি।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "দেহাতের মানুষ আমরা, গরুর গাড়ি ছাড়া চলে নাকি? গাঁয়ের মানুষদের এটাই তো ভরসা।"

বরদা বুঝতে পারল, গরুর গাড়িতে চাপিয়ে মহাদেবকে, মানে বেহুঁশ মহাদেবের শরীরটাকে এতটা রাস্তা বয়ে এনেছেন সিদ্ধেশ্বর। কোনো সন্দেহ নেই, বরদারা বেরিয়ে পড়ার অনেক আগেই সিদ্ধেশ্বর বেরিয়ে পড়েছিলেন। উনি তো বরদাকে বলেই এসেছিলেন, 'আমি তা হলে এগিয়ে যাচ্ছি।'

বরদা বলল, "আপনি কি সোজা এই রাস্তা ধরে এসেছেন? দেখতে পেলাম না তো?"

"খানিকটা সোজা এসেছি, তারপর জঙ্গলের মধ্যে মেঠো রাস্তা ধরে।"

"একলা এসেছেন?

"একলা। মহাদেবের যদিও করার ক্ষমতা কিছু নেই, তবু ওর হাত দুটো বেঁধে রেখেছিলাম।" বলে একটু যেন হাসলেন।

বরদা বলল, "আপনার কি এখানে এসেই অপেক্ষা করার কথা ছিল?"

"হ্যাঁ। এই জায়গাটাকেই ঝাড়িখাস বলে। পলাশ বনের এই দিকটাকে। কাছেই গ্রাম রয়েছে কাঠুরেদের।"

বরদা বুঝতে পারল, সতীশের সঙ্গে সিদ্ধেশ্বর ভেতরে-ভেতরে এই মতলবটাই তবে এঁটেছিলেন। সিদ্ধেশ্বর নিজে মহাদেবকে নিয়ে এখানে এসে অপেক্ষা করবেন, আর সতীশ আনবে বরদাকে। সবই মতলব-মতন করা হয়েছে, ছক অনুযায়ী। সতীশের মোটর-বাইক খারাপ হয়ে যাওয়াটা নিছকই ধোঁকা দেওয়া।

সতীশ কাছাকাছি এল। এসে আবার বাইকের মুখ ঘুরিয়ে পলাশ বনের দিকে চলে গেল।

অনেকক্ষণ ধরেই দাঁড়িয়ে আছে বরদা। পা ধরে যাচ্ছিল। মহাদেব মাটিতে বসে। এই মহাদেবকে একেবারে নির্জীব, অক্ষম, অসহায় দেখাচ্ছিল। তার কিছু করার নেই। কথাও বলতে পারছে না। হয়ত বলতেও চাইছে না।

বরদা আবার একবার টর্চ জ্বালল, মুখ দেখল মহাদেবের।

মুখে আলো পড়ায় মহাদেব মাথা তুলল। বিরক্ত হল। কী যেন বলল, তারপর জোরে-জোরে মাথা ঝাঁকাল।

টর্চটা নিবিয়ে দিল বরদা।

"মহাদেবকে কী করবেন ভেবেছেন?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমরা কিছু করব না। যা করার সুজন করবে।"

"সুজন?"

"সুজন তো মহাদেবের বন্ধু। সে আসুক। দেখুক মহাদেবকে।"

সুজনের নামেই বরদার আবার কেমন ভয়-ভয় করে উঠল। বলল, "সুজন আসবে?"

"আসবে। আসার কথা। মহাদেব তার বন্ধুকে ডেকেছে, আসবে না কেন?"

"মহাদেব কি সুজনকে আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি জানেন ঠিক?"

"বেশ তো, দেখুন না— ?"

সতীশ আবার ফিরে আসছে। একবার তার গাড়ির বাতিটা জ্বালল। আবার নিবিয়ে দিল। নির্জন, নিস্তব্ধ এই প্রান্তরে মোটর-বাইকের ফটফট শব্দটা কেমন ভৌতিক শোনাতে লাগল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বরদা বলল, "সুজন যদি আসে, আমরা কী করব?"

"আমরা কিছু করব না। শুধু দেখব। দেখব, সুজনের মুখের সামনে যে শিকার রেখেছি সেই শিকারের কী অবস্থা হয়!"

বরদা চমকে উঠে বলল, "মহাদেব তো সুজনের বন্ধু। সুজন ওর হাতের লোক।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "মহাদেবের গায়ে আপনার প্যান্ট-জামা রয়েছে। সুজন মানুষ চিনবে না, রাত্তিরে সে গন্ধ চিনেই আসবে। চোখেও ভাল দেখতে পাবে না। আর মহাদেবকে তো দেখছেন, তার কথা বলার মতন অবস্থা নেই।"

বরদাকে আর বলতে হল না, সে বুঝতে পারল, সুজন যদি শিকারী কুকুরের মতন গন্ধ শুঁকে একবার মহাদেবের দিকে চলে আসতে পারে, তবে মহাদেবের আর বাঁচার আশা নেই। কিছুই করতে পারবে না মহাদেব। তার কোনো ক্ষমতাই থাকবে না নিজেকে বাঁচাবার। টাঙাঅলার মতন অবস্থা হবে তার।

ভয়ে কেমন শিউরে উঠল বরদা। বলল, "মহাদেব মরবে?"

সিদ্ধেশ্বর কঠিন গলায় বললেন, "টাঙাঅলা কেমন করে মরেছিল আপনি কি দেখেছিলেন? মহাদেবকে আজ সেইভাবে মরতে হতে পারে। নিজের ফাঁদে নিজেই পড়েছে মহাদেব, আমার কিছু করার নেই।"

সতীশ তখন সামান্য দূরে। দূর থেকেই চেঁচিয়ে কী যেন বলল। শোনা গেল না।

তাকালেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "সুজন বোধহয়।"

বরদা কেঁপে উঠল। তাকিয়ে থাকল।

কিছুই নজরে আসছিল না। তারপর চোখে পড়ল, ছায়ার মতন কে যেন ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে এদিকেই।

"সুজন বরদা বলল, বলেই হাত চেপে ধরল সিদ্ধেশ্বরের।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি মদন সরকার

আমার ভিনুভাই

পঙ্কজ রায়

চল্লিশ বছর আগের কথা। বোম্বাইয়ে ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে লর্ড টেনিসনের দলের বিরুদ্ধে ভারতের দ্বিতীয় আন-অফিসিয়াল 'টেস্ট' চলছে। প্রথম ইনিংসে ভারতের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটল। সাকুল্যে ১৫৩ রান। এর মধ্যে ৩৮টি এল বিশ বছর বয়েসী এক নবাগতের ব্যাট থেকে। ভারতীয় খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ঐ যুবকটিই আবার ৮৮ রান করলেন। দলের রান ২০৮। সেই টেস্টে ভারত পরাজয় এড়াতে পারেনি, কিন্তু মাদ্রাজে চতুর্থ টেস্টে তিনি ভারতের প্রথম উইকেট পড়ার পর ব্যাট করতে নেমে ওয়েলার্ড, গোভার আর পোপের মতো সাংঘাতিক ফাস্ট বোলারদের বল কাট, হুক করে ১১৩ রান করেন। এরপর বোলিংয়ে ৩।১৮ আর ৩।৫৫। ভারত ঐ টেস্ট ইনিংসে জিতেছিল। এইভাবেই ভারতের টেস্ট ক্রিকেট মঞ্চে আবির্ভূত হলেন ভিনু মানকড়। আমার ভিনুভাই।

বলা বাহুল্য, ঐ টেস্টগুলো আমি দেখিনি। কাগজে রিপোর্ট পড়েছি, বড়দের মুখে আলোচনা শুনেছি। ভিনু মানকড় তখনও আমার ভিনুভাই হননি। তাঁর সঙ্গে খেলার সুযোগ হয়েছে আরও অনেক পরে ১৯৫১ সালে। শুধু সুযোগ বলি কেন? সৌভাগ্য। কারণ এখনও পর্যন্ত তিনি কেবল ভারতেরই শ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার নন, নিজের গুণে বিশ্বের সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডারদের মধ্যে তিনি তাঁর জায়গা করে নিয়েছেন।

ভিনু মানকড় (ডাইনে) ও পঙ্কজ রায়। পিছনে সেই রেকর্ড স্কোর

কবে ভিনুভাইয়ের খেলা প্রথম দেখেছি মনে নেই। ১৯৪৫ সালে হ্যাসেটের নেতৃত্বে যে অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিস দল খেলতে আসে তার বিরুদ্ধে ইডেনে টেস্ট ম্যাচে কি? হতে পারে। সার্ভিস দলে ছিলেন কিথ মিলার, হুইটিংটন, পেটিফোর্ড, পেপার, রোপার এইসব নাম-করা খেলোয়াড়। আর ভারতের খেলোয়াড়দের মধ্যে মার্চেন্ট, মুস্তাক আলি, মানকড়, রুসি মোদি, ফাদকার, আবদুল হাফিজ কারদার, সি এস নাইডু, বিজয় হাজারের নাম মনে পড়ছে। ঐ ম্যাচে ভিনুর একটি ওভারের কথা আজও আমার মনে আছে। আর নিশ্চয়ই মনে আছে মিলারের। ভিনুর তিনটি ঝোলানো বলে মিলার পর-পর তিনটি ওভার বাউন্ডারি মারেন। পরের বলটি ভিনু অফস্টাম্পের বাইরে দেন। তার পরের বলটির ফ্লাইট মিস করে মিলার একেবারে স্টাম্পড হয়ে যান। মিলারের মতো খেলোয়াড়কে এইভাবে লোভ দেখিয়ে আউট করায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সারা ইডেন। আসলে ন্যাটা বোলার ভিনুর স্পিনগুলো ছিল মারাত্মক। লেংথ আর কণ্ট্রোল ছিল নিখুঁত। এর সঙ্গে ছিল পেস ও ফ্লাইটের সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ক্ষমতা। তাই তাঁকে খেলা ব্যাটসম্যান-দের পক্ষে বেশ শক্ত হত।

১৯৫২ সালে চীপকে ভারত নাইজেল হাওয়ার্ডের ইংল্যান্ড দলকে ইনিংসে হারিয়ে প্রথম অফিসিয়াল টেস্ট জয়ের স্বাদ পায়। সেই খেলাতে ভিনুভাইয়ের বোলিং, উমরিগড় ও আমার সেঞ্চুরি আর খোকনদার (পি সেন) পাঁচটা স্টাম্পিং খুব কাজ দিয়েছিল। ভিনুভাইয়ের সে কী রুদ্রমূর্তি। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের আটটি উইকেট তিনি পেয়েছিলেন মাত্র ৫৫ রানের বিনিময়ে। এর মধ্যে শেষ পাঁচটি আবার ৬·৫ ওভারে ৯ রান দিয়ে। ঐ মোক্ষম বোলিংয়ের জের ইংল্যান্ড কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সত্যি ভিনু-ভাইকে যদি বোলিং করতে না হত, তা হলে ব্যাটিংয়ে তিনি আরও অনেক বড় হতেন। ব্র্যাডম্যান একবার বলেছিলেন যে, হ্যামন্ড ব্যাটিং নিয়ে অত মাথা না ঘামালে বিরাট বোলার হতে পারতেন। মনে রাখতে হবে, অধিকাংশ ম্যাচেই ভিনুভাইকে ওভারের পর ওভার অক্লান্তভাবে বল করেই ইনিংস ওপন করতে হয়েছে এবং তাতেই তিনি অত রান পেয়েছেন। তাঁর পাঁচটা টেস্ট সেঞ্চুরিই ওপনার হিসেবে। এ-যে কত বড় কৃতিত্ব, তা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তিনি যদি মিডল অর্ডারে ব্যাট করতেন, তা হলে নিশ্চয়ই অনেক রান তাঁর খাতায় জমা হত। এক থেকে এগারো নম্বর পজিশনে প্রয়োজন অনুসারে ব্যাট করেছেন সমান দক্ষতার সঙ্গে।

১৯৫২ সালেই লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অলরাউন্ডার ভিনুভাই বোধহয় তাঁর জীবনের সেরা খেলাটি খেলেন। সে-ম্যাচে ভিনুভাইয়ের খেলার অন্যতম সাক্ষী আমি—ঐতিহাসিক ঐ টেস্টে তাঁর সঙ্গে ভারতের ইনিংস ওপন করার সুযোগ আমার হয়েছিল। লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কার্যত একা লড়ে গিয়েছিলেন ভিনুভাই। প্রথম ইনিংসে ৭২ (ভারত ২৩৫), দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮৪ (ভারত ৩৭৮), আর বোলিংয়ে প্রথম ইনিংসে ৭৩-২৪-১৯৬-৫। অর্থাৎ স্মরণীয় ১৮৪ রান এসেছিল ৭৩ ওভার বল

পরীক্ষায় কম নম্বর পেতে হলে ভাল বই পড়ার দরকার নেই।

ভালো নম্বর পেতে হলে চাই ভালো বই আর মন দিয়ে পড়াশোনা।

এছাড়া

একটি মজার বই
বাংলা ভাষায় এমনটি
আর নাই।
সত্যজিৎ রায়
ভূমিকা লিখেছেন,

দি নিউ বুক স্টল
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০০৯

করে পাঁচটি উইকেট পাওয়ার পরে। আর কী সেই ইনিংস! বেডসার লেকার, ট্রুম্যান, জেঙ্কিনসের মতো বোলারদের বিন্দুমাত্র সম্ভ্রম না করে হুক কাট ড্রাইভ পুল ইত্যাদির—এক কথায় ক্রিকেটের ব্যাকরণে যতরকম মার আছে তা সবের—সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন ঐ ইনিংসে। চলতি কথায় আমরা যাকে বলি 'মারের ফুলঝুরি'। মহাভারতে আছে, রাজা জয়দ্রথকে শিব একদিনের জন্যে বর দিয়েছিলেন যে, রাজা যে-কাজ করবেন সেটাই ঠিক হবে। ভিনুভাইকেও বোধহয় ক্রিকেটের দেবতা সেদিন ঐরকম একটা কিছু বর দিয়েছিলেন। কে যেন লিখেছিলেন, ইংল্যান্ডের ক্রীড়া-সাংবাদিকরা সেদিন ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন, ভিনু ও তাঁর খেলার বর্ণনার যোগ্য বিশেষণ খুঁজে-খুঁজে। ব্যাপারটা অনেকটা তাই। সমস্ত খেলাটাকে 'মানকড়ের টেস্ট' বললেও বোধহয় সব বলা হয় না। স্বাভাবিক-ভাবেই ওঁকে নিয়ে আমরা খুব মাতামাতি করেছিলাম। রানী এলিজাবেথ ভিনুভাইকে বিশেষ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বিজয়ী ইংল্যান্ড দলের কাপ্তেন লেন হাটন বললেন, "আমি জোর করে বলতে পারি যে, টেস্ট ম্যাচে আমাদের বিরুদ্ধে ভিনু মানকড়ের অল-রাউণ্ড কৃতিত্বের চেয়ে বেশি বড় আর কিছু আমি দেখিনি বা পড়িনি। তিনি বিশ্বশ্রেষ্ঠদের অন্যতম।" তখন হ্যাসলিংডেন ক্লাবে ভিনুভাই খেলতেন। সেখান-কার মেয়র বলেছিলেন, "হ্যাসলিংডেন মানকড়ের জন্যে গর্ব অনুভব করছে।" হ্যাসলিংডেনে ভিনুভাইকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। ওখানকার লোকেরা সার্বিক মতে লাল কার্পেট বিছিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে তাঁদের প্রিয় খেলোয়াড়কে বীরোচিত সম্বর্ধনা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, ভিনুভাইয়ের প্রবল অনিচ্ছা থাকায় তাঁদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

ঐ বছরই ওভালে শেষ টেস্টে একটা ঘটনায় ভিনুভাইয়ের আত্মমর্যাদাবোধ তথা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ক্ষমতা দেখে অবাক হই। হাটনের বিরুদ্ধে একের পর এক মেডেন আদায় করে যাচ্ছেন ভিনুভাই। আটটা মেডেন হওয়ার পর হাটনের মত ধীরস্থির খেলোয়াড়েরও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। নবম ওভারে ভিনুভাই বলটা ডেলিভারি করার আগেই ক্রীজ থেকে একটু এগিয়ে-পেছিয়ে এমন ভাবভঙ্গি করছিলেন যাতে ভিনুভাই বলটি ঠিক লেংথে না ফেলতে পারেন। তখন ভিনুভাই ছুটে এসে বল ডেলিভারি না করে হাটনকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন, "ডু য়ু থিঙ্ক য়ু আর প্লেয়িং এগেনস্ট এ স্কুলবয় ? প্লে প্রপারলি।" ঐ ওভারটিও মেডেন নিয়েছিলেন ভিনুভাই।

ভিনুভাইয়ের রেকর্ডের কথা নতুন করে কী আর বলব ? তাঁর মৃত্যুর পর সে সম্পর্কে কাগজে তো অনেক কিছুই বেরিয়েছে। আমি শুধু ভিনুভাইকে যতটা দেখেছি বা তাঁর মুখে যে-সব কাহিনী শুনেছি তারই কিছু এখানে রোমন্থন করছি। শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখি যে, তিনি ৪৪টি টেস্ট খেলে ২,১০৯ রান (গড় ৩১·৪৭) করেছেন ও ১৬২ উইকেট (গড় ৩২·৩১) নিয়েছেন। ১৯৪৬ সালের ইংল্যান্ড সফরে তাঁর ১১২০ রান ও ১২৯ উইকেটের রেকর্ড কোনও ভারতীয় খেলোয়াড় আজ পর্যন্ত ছুঁতে পারেননি। আর এককভাবে টেস্ট রেকর্ড ভারতের তথা ভারতীয় খেলোয়াড়দের যে দুটি আছে সে দুটিতেই ভিনু মানকড় জড়িত। একটি হল তাঁর নিজস্ব দ্রুততম ডাবল অর্থাৎ সবচেয়ে কম (২৩) টেস্টে হাজার রান ও একশো উইকেট লাভ। আর একটা প্রথম উইকেট-পার্টনারশিপের রেকর্ড—এটাও চাঁপকে—১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ভাবতে আনন্দ হচ্ছে যে, সেদিনের সেই ক্রিকেট ইতিহাস রচনার ক্ষণে আমিই ছিলাম ভিনুভাইয়ের পার্টনার। ঐ খেলার কথায় পরে আসছি।

ভিনু মানকড় (ডাইনে) ও নরি কণ্ট্রাকটর মাঠে নামছেন

মনের জোর না থাকলে বড় হওয়া যায় না। ভিনুভাইয়ের ঐ গুণটি ছিল ষোল আনা। শুধু তাই নয়, তাঁর ভুল ধরিয়ে দিলে শুধরে নিতে তাঁর একটুও দেরি হত না। তাঁর মুখেই শুনেছি, ১৯৪৭ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে দুটি টেস্ট সমেত প্রথম তিনটি ম্যাচের সব ইনিংসে তিনি লিণ্ডওয়ালের বলে আউট হন। পাঁচবার বোল্ড, একবার কট। তার মধ্যে দু'বার লিণ্ডওয়াল ভিনুভাইকে ইয়র্কার দিয়ে আউট করেছিলেন। একদিন সন্ধেয় কোনও একটি ক্লাবে তিনি কথায়-কথায় লিণ্ডওয়ালকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "লিণ্ডি, হোয়াট্স রং উইথ মি ? হাউ ডিড য়ু ম্যানেজ টু গেট মি টোয়াইস ?" লিণ্ডওয়াল হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "ওয়াচ ইয়োর ব্যাকলিফট।" এরপরই ভিনুভাই চেষ্টা করে-করে ব্যাক-লিফট অনেকটা কমিয়ে ফেলেন। আর সেঞ্চুরি পান। শুধু তৃতীয় টেস্টে নয়, পঞ্চম টেস্টেও।

ভিনুভাইয়ের মুখে আর-একটা ঘটনাও শুনেছি। অনেকেই এটা জানেন। অস্ট্রেলিয়ার ওপনিং ব্যাটসম্যান ডব্রিউ এ ব্রাউনের স্বভাব ছিল বোলারের বল ডেলিভারি শেষ হওয়ার আগেই ক্রীজ ছেড়ে একটু-একটু করে এগিয়ে যাওয়া, যাতে তাড়াতাড়ি রান নেওয়ার সুবিধে হয়। ভিনুভাই এটা জানতেন। একটা টেস্ট ম্যাচে ব্রাউন ক্রীজ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরে ভিনুভাই বল ডেলিভারি করতে এসে থেমে গিয়ে বলসুদ্ধ হাতটা উইকেটের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে সতর্ক করে দেন এবং ঐরকম করতে নিষেধ করেন। টেস্ট ম্যাচে কেউ

কাউকে ছেড়ে কথা কয় না, ভিন্নুভাই যদি তখনই ব্রাউনকে রান আউট করে দিতেন, কারও কিছু বলার ছিল না। তাই দর্শকরা ভিন্নুর এই খেলোয়াড়সুলভ আচরণকে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করেছিলেন। কিন্তু ব্রাউনের স্বভাব যাবে কোথায় ? একটু পরেই তিনি আবার ক্রীজ ছেড়ে বেরিয়ে যান। মানকড় তখন তাঁকে 'আই ওয়ার্নড য়ু ফার্স্ট, দিস টাইম আই ওণ্ট স্পেয়ার য়ু', বলে রান আউট করে দেন। আবার সারা মাঠ ভিন্নুর কাজে সম্মতি জানাল করতালি দিয়ে।

আর একবারের ঘটনা আমি নিজেই দেখেছি। সে-বার ভিন্নুভাই ছেড়ে দিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের স্বনামধন্য ফ্র্যাঙ্ক ওরেলকে। ১৯৫৩ সালে আমরা যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর করি সেবার টেস্ট সিরিজটা ওরেলের খুব খারাপ যাচ্ছিল। অন্তত প্রথম তিনটি টেস্টে তাঁর ভাল রান আসেনি। শেষ টেস্ট ছিল ওরেলের নিজের মাঠে অর্থাৎ কিংস্টনের সাবিনা পার্কে। নিজস্ব ২২ রানের মাথায় ওরেল ভিন্নুভাইয়ের একটা বল মিড-অনে ড্রাইভ করে শর্ট রান নিতে যান। কিন্তু সেখান থেকে বল ছুঁড়ে আমি উইকেট ভেঙে দিই। আম্পায়ার আউট দিলেন, সকলেই দেখলেন ওরেল আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছেন প্যাভিলিয়নে। এমন সময় ভিন্নুভাই ছুটে গিয়ে ওরেলকে ফিরে আসতে বললেন। কী ব্যাপার ? আম্পায়ারকে তিনি বোঝালেন যে, বল ডেলিভারির পর ফলো-থ্রুর সময় ওরেলের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি হয়ে যায়। তাতে ওরেল একটু বাধা পেয়েছিলেন, যার ফলে ক্রীজে তিনি সময়মতো পৌঁছতে পারেননি। দেখলাম, ভিন্নুর কথামতো আম্পায়ার ওরেলকে আবার ডেকে নিলেন। আমরা ভিন্নুভাইয়ের খেলোয়াড়ি মনের পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। ওরেল সেবার ২৩৭ রান করেন। পঁচিশ বছর আগের কথা হলেও আমার বেশ মনে আছে যে, ঐ ইনিংসেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অপর দুই ডব্লিউও সেঞ্চুরি করেছিলেন—উইক্স ১০৯ আর ওয়ালকট ১১৮। আমাদের দিকে সেঞ্চুরি ছিল প্রথম ইনিংসে উমরিগড়ের (১১৭), দ্বিতীয় ইনিংসে মঞ্জরেকার(১১৮) ও আমার (১৫০)।

মাদ্রাজে প্রথম দিনের শেষে আমার ১২৯ রান ছিল ও ভিন্নুভাইয়ের ১০০। দ্বিতীয় দিন যখন বোঝা গেল যে, আমাদের জুটিতে টেস্ট রেকর্ড হতে চলেছে, ভিন্নুভাই আমার কানে কানে বললেন, ''সিন্স উই আর সো ক্লোজ টু এ টেস্ট রেকর্ড, লেটস ট্রাই ফর ইট।''

আমি সেবার সবে চশমা নিয়েছি। একটু অস্বস্তি যে হত না তা নয়। বোধহয় সে কথা ভেবেই তিনি বললেন, ''পঙ্কজ, ইউ কীপ আপ ইয়োর এন্ড, লেট মি প্লে ফাস্ট ক্রিকেট।'' সেইভাবেই তিনি খেললেন এবং ৪১৩ রানের মধ্যে করলেন ২০৩। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব রান দাঁড়ায় ২৩১। বলা বাহুল্য, রেকর্ড ভাঙার পরেও আমরা রানটাকে বাড়িয়ে রাখলাম এইজন্যেই যাতে এ-রেকর্ড সহজে না ভাঙে।

ক্লোজ-ইন ফিল্ডিংয়ে ভিন্নুভাই বিশেষ দক্ষ ছিলেন। আর নিজের বোলিংয়ে ফিল্ডিং করার ব্যাপারে তাঁর জুড়ি কেউ ছিল বলে জানি না। বোলিংয়ে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সেরা-সেরা ব্যাটসম্যানদের উইকেট তিনি নিয়েছেন। এ-সবের মধ্যে ব্র্যাডম্যানের উইকেট আছে তিন-তিনটি।

এই ছিলেন ভিন্নুভাই। তাঁর মৃত্যুতে আত্মীয়বিয়োগের ব্যথা অনুভব করছি।

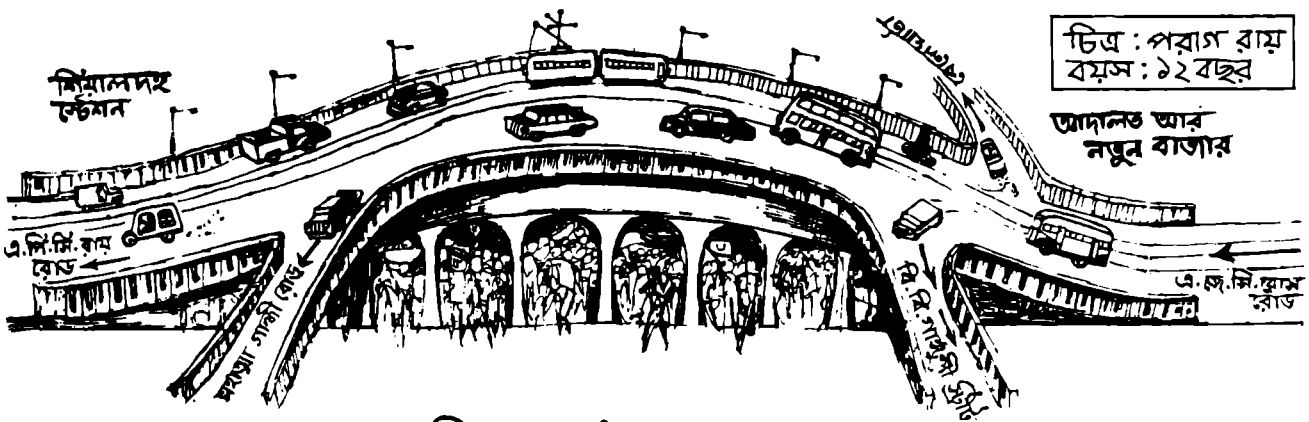

আজ তোমাদের শিয়ালদার উঁড়ালপুলের কথা বলব।

শিয়ালদার নাম করলেই তোমাদের একটা প্রচন্ড ভীড়ের ছবি মনে পড়ে না? এখানে রোজ ৮ লক্ষ লোক কোন না কোন কাজে আসে যায়। কাজেই ভীড় ধাক্কাধাক্কি তো হবেই। ভাবতে পার তাড়াহুড়োর সময়গুলোতে ঘন্টায় ৫৫ হাজার রেলযাত্রী শিয়ালদায় আসেন ও ২৫ হাজার বাইরে যান? ভীড়ের টাইমে ২০ হাজার গাড়ী ঘোড়া এই এলাকায় চলাচল করে। আর ...... আর হয় অ্যাক্সিডেন্ট, জ্যাম ......।

তাই, শিয়ালদায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডের ওপর একটা মস্ত উঁড়ালপুল তৈরী করা হচ্ছে। ঐ পুল থেকেই মহাত্মা গান্ধী রোড, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট আর বেলেঘাটা মেন রোডের শাখা বেরিয়ে যাবে। পুলের তলায় থাকবে সব বড় বড় ফোকর। যার ফাঁক দিয়ে লোকজন পায়ে হেঁটে যেতে পারবে নির্বিঘ্নে। দোকান ঘরও থাকবে।

জ্যাম - অ্যাক্সিডেন্ট হবে না কারণ — পুলের উপর দিয়ে যাবে সব রকম গাড়ী, লরী বাস — এমন কি ট্রামও। কাজেই গাড়ীর ভীড় যাবে ওপর দিয়ে আর মানুষের ভীড় থাকবে নীচে।

কলকাতার উন্নতিতে সি.এম.ডি.এ-র এটা হবে একটা বড় রকমের কাজ। কাজ আরম্ভ হয়েছে। একদিন দেখে এসো ভীড়ের সময়......

কলকাতা শহরটা কার? আমাদের সকলের। (সি. এম. ডি. এ কর্তৃক প্রচারিত)

কমনওয়েলথ গেমস্ ও আমরা

মুকুল দত্ত

তোমরা তো জানোই, আগস্টের ৩ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত কানাডার এডমণ্টন শহরে জাঁকজমকের সঙ্গে যে কমনওয়েলথ গেমস হয়ে গেছে, ভারতের প্রতিযোগীরা সেখান থেকে ১৫টি পদক জয় করে ঘরে ফিরেছে। ১৫টি পদকের মধ্যে ৫টি সোনার, ৪টি রুপোর, ৬টি ব্রোঞ্জের।

একটা কথা তোমাদের জানানো দরকার। এই যে আমরা সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জ লিখি—ওটা লিখি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের মর্যাদা বোঝাতে। পদকগুলি কিন্তু খাঁটি সোনা-রুপো

প্রকাশ পাড়ুকোন

দিয়ে তৈরি হয় না। অন্য ধাতুতে তৈরি পদকের উপর সোনা ও রুপোর জলের একটা আবরণ থাকে। যাই হোক, পদক তালিকায় ভারত পেয়েছে ছেচল্লিশটি দেশের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান। শীর্ষস্থান পেয়েছে কানাডা। তাদের পদক সংখ্যা ১০৯টি। ৮৮টি পদক পেয়ে দ্বিতীয় স্থান ইংল্যান্ডের, ৮৪টি পদক বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার স্থান তৃতীয়। চতুর্থ স্থানে আছে কিনিয়া, পঞ্চম স্থানে নিউজিল্যান্ড। কিনিয়া কিন্তু ১৮টি ও নিউজিল্যান্ড ২১টি পদক পেয়েছে। তিনটি পদক বেশি পেয়েও নিউজিল্যান্ডের স্থান কিনিয়ার নীচে কেন? বেশি সোনার পদকের জন্য। কিনিয়া পেয়েছে সাতটি সোনার পদক, নিউজিল্যান্ড পাঁচটি। তাই নীচে নেমে গেছে।

জানো বোধহয়, কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয় অলিম্পিকসের ধাঁচে। এবং গোড়া থেকে ধরলে কমনওয়েলথ গেমসের পরিকল্পনাও আধুনিক অলিম্পিক গেমসের সঙ্গে সঙ্গে, যদিও প্রথম গেমস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩০ সালে। আগে নাম ছিল ব্রিটিশ এম্পায়ার গেমস। এখন নাম কমনওয়েলথ গেমস। অলিম্পিক হয় চার বছর অন্তর অন্তর, অংশ গ্রহণ করে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ। প্রতিযোগিতা চলে পনের দিন ধরে। খেলার বিষয় থাকে কুড়ি-বাইশটি। কমনওয়েলথ গেমসও হয় চার বছরের ব্যবধানে। অংশ নেয় কমনওয়েলথের সঙ্গে গাঁটছড়া-বাঁধা পঁয়ত্রিশ-চল্লিশটি দেশ। প্রতিযোগিতা চলে দশ দিন। খেলাধুলো হয় দশ-এগারোটি বিষয়ে। দুটি গেমসই চার বছর অন্তর হয়, কিন্তু দুই গেমসের মধ্যে ব্যবধান থাকে দুই বছরের। অর্থাৎ অলিম্পিকসের দু বছর পরে কমনওয়েলথ গেমস। আবার কমনওয়েলথ গেমসের দু বছর পরে অলিম্পিক গেমস। এবারই সব চেয়ে বেশি দেশ এবং বেশি প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা ছিল—আগেই লিখেছি ৪৬ ; প্রতিযোগীর সংখ্যা প্রায় ২,০০০।

কোন বছর কোথায় কমনওয়েলথ গেমস হয়েছে, এবং কত

খেলার সময়ে

দেশ ও কত প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে তার একটা হিসাব দিচ্ছি।

সন	স্থান	দেশ	প্রতিযোগী
১৯৩০	হ্যামিল্টন (কানাডা)	১১	৪০০
১৯৩৪	লণ্ডন (ইংল্যাণ্ড)	১৬	৫০০
১৯৩৮	সিডনি (অস্ট্রেলিয়া)	১৫	৪৬০
১৯৫০	অকল্যাণ্ড (নিউজিল্যাণ্ড)	১২	৫৯০
১৯৫৪	ভ্যাংকুভার (কানাডা)	২৪	৬৬০
১৯৫৮	কার্ডিফ (ওয়েলস)	৩৫	১১৩০
১৯৬২	পার্থ (অস্ট্রেলিয়া)	৩৫	৮৬০
১৯৬৬	কিংসটন (জামাইকা)	৩৪	১০৫০
১৯৭০	এডিনবার্গ (স্কটল্যাণ্ড)	৪২	১৩৮৯
১৯৭৪	ক্রাইস্টচার্চ (নিউজিল্যাণ্ড)	৩৮	১২৭৫
১৯৭৮	এডমণ্টন (কানাডা)	৪৬	২,০০০ (আনুমানিক)

এপরের এই তালিকা থেকে দেখতে পাচ্ছ যে, কানাডায় প্রথম গেমসের আসর বসেছিল। এবার নিয়ে তিনবার ওই দেশে গেমস হল। খেলাধুলায় যে-সব দেশ অনেক এগিয়ে আছে, যেমন আমেরিকা, রাশিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি, হাঙ্গারি এবং ইউরোপের অনেক দেশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে এ গেমসে অংশ নেয় না। তবু কিন্তু পৃথিবীর প্রচুর নামী ও বিশ্বরেকর্ডধারী সাঁতারু ও অ্যাথলীট যোগ দিয়ে থাকে। এর

মধ্যে ৪৫টি সোনার, ৩১টি রুপোর ও ৩৩টি ব্রোঞ্জের মেডেল পেয়ে কানাডার শীর্ষস্থান দখল যথেষ্ট উন্নতির পরিচায়ক। মনট্রিয়ল ও মিউনিখ অলিম্পিকে কানাডা একটিও সোনার মেডেল পায়নি। ক্রাইস্টচার্চ কমনওয়েলথ গেমসে পেয়েছিল তৃতীয় স্থান, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের পরে থেকে। সোনার পদক পেয়েছিল ২৫টি। আর এবার ৪৫টি পেয়ে একেবারে ওপরে উঠে গেল। এর জন্য আগে থেকে কানাডা পরিকল্পনা করেছিল। ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। ইচ্ছে, আগ্রহ ও চেষ্টা থাকলে যে অল্প সময়ে অনেক এগিয়ে যাওয়া যায়—কানাডার এই সাফল্য তার প্রমাণ। কানাডার কর্মকর্তারা গেমসটি সম্পন্ন করেছেনও সুচারুভাবে। সাংস্কৃতিক উৎসব এবং খেলার বেশ কিছু ছবি তোমরা বোধহয় টেলিভিশনে দেখেছ।

আমাদের ভারত থেকেও এবার সবচেয়ে বড় দল গিয়েছিল এডমন্টনে। প্রতিযোগী ছিল ৪৪ জন। কর্মকর্তা-কোচদের নিয়ে ৬৪ জনের মস্ত বড় দল। কিন্তু ৪৪ জন প্রতিযোগীর পনেরোটি পদক লাভ আমাদের খেলাধুলোর উন্নত মানের কথা বলে না। চার বছর আগে ক্রাইস্টচার্চ থেকেও তো ভারতের মাত্র কুড়িজন প্রতিযোগী পনেরোটি পদক নিয়ে এসেছিল। সেবারও দখল করেছিল ষষ্ঠস্থান। দশজন কুস্তিগীরই পেয়েছিল দশটি পদক।

দশ রকমের খেলাধুলোর মধ্যে ভারত বোউলিংয়ে এবং সাঁতারে অংশ নেয়নি। বাকি বিষয়ের মধ্যে জিমন্যাস্টিকস, ডাইভিং, শ্যুটিং, সাইক্লিংয়ে কোনো স্থান পায়নি। নয়জন অ্যাথলীট দলের সংগ্রহ মাত্র একটি ব্রোঞ্জ। তবে একটু আশার কথা এবং উল্লেখ করার মতো ঘটনা এই যে, যে-দুটি বিষয়ে আমরা আগে কখনো সোনার পদক পাইনি, এবার সেই ব্যাডমিন্টন ও ভারোত্তোলনে সোনা পেয়েছি প্রকাশ পাড়ুকোন ও এনাত্তুর করুণাকরনের কৃতিত্বে। কে কোন বিষয়ে কোন পদক পেয়েছে নীচের তালিকায় দেখ।

সোনার পদক : ১। প্রকাশ পাড়ুকোন (ব্যাডমিন্টনে সিংগলস চ্যাম্পিয়ন), ২। ই করুণাকরণ (ভারোত্তোলনের ফ্লাইওয়েটে চ্যাম্পিয়ন), ৩। অশোককুমার (কুস্তির লাইটওয়েটে চ্যাম্পিয়ন), ৪। সংবীর সিং (কুস্তির ব্যান্টামওয়েটে চ্যাম্পিয়ন), ৫। রাজিন্দার সিং (কুস্তির ওয়েল্টারওয়েটে চ্যাম্পিয়ন)।

রুপোর পদক : ১। তামিল সেলভান (ভারোত্তোলনের ব্যান্টামওয়েটে), ২। সুদেশকুমার (কুস্তি-ফ্লাইওয়াট), ৩। জাগমিন্দার সিং (কুস্তি—ফেদারওয়েট), ৪। সংপাল সিং (কুস্তি—হেভিওয়েট)।

ব্রোঞ্জ পদক : ১। বীরেন্দ্র সিং থাপা (বক্সিং লাইট ফ্লাইওয়েট), ২। সুরেশ বাবু (লং জাম্প), ৩। আমি ঘিয়া ও কানোয়াল ঠাকুর সিং (মেয়েদের ব্যাডমিন্টনে ডাবলস), ৪। জগদীশকুমার (কুস্তি—লাইটওয়েট), ৫। কারতার সিং (কুস্তি—লাইট হেভিওয়েট) ও ৬। ঈশ্বর সিং (কুস্তি—সুপার হেভিওয়েট)।

দেখতেই পাচ্ছ, পনেরোটির মধ্যে নয়টি পদকই পেয়েছে কুস্তিগীররা। দশজন কুস্তিগীরের মধ্যে শুধু পান্নালাল যাদব খালি হাতে ফিরেছে। কুস্তির লড়াইতেই কমনওয়েলথ গেমসে আমাদের যা কিছু কৃতিত্ব। ১৯৩৮-এ সিডনির তৃতীয় গেমস থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আমাদের সংগ্রহ মোট উনিশটি স্বর্ণপদকের মধ্যে ষোলটিই এনেছে মল্লবীরেরা। এবার প্রকাশ পাড়ুকোন ও করুণাকরনের দুটি বাদে আর একটি স্বর্ণপদক পেয়েছে দৌড়বীর মিলখা সিং কার্ডিফ গেমসে ৪৪০ গজ দৌড়ে।

এবার আমরা অবশ্য আরও দু-তিনটি পদক পেতাম, কোচরা যদি ভুল না করতেন। ভারোত্তোলক সেলভানের সোনা তো প্রায় হাতের মধ্যেই ছিল। শেষ লিফ্‌টে আড়াই কিলোগ্রাম বেশি ওজন তুলে যেখানে স্বর্ণপদক অবশ্যম্ভাবী সেখানে কোচ চাপিয়ে দিলেন সাড়ে সাত কিলোগ্রাম বেশি। সেলভান কাঁধ পর্যন্ত ভার তুলে মাথার ওপর তুলতে পারল না। নির্ঘাত সোনা হারাল ভারত। একই ধরনের ভুলে অনিল পাল ও অনিল মন্ডল ওয়েটলিফটিংয়ে চতুর্থ হয়ে গেল। যেখানে প্রকাশ পাড়ুকোন সহজেই ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, পার্থ গাঙ্গুলী ও সৈয়দ মোদী কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছে, আমি খিয়া ও ঠাকুর সিং পেয়েছে ব্রোঞ্জ পদক, সেখানে পুরুষ-মেয়ের মিলিত দলগত ব্যাডমিন্টনে ভারত কোনো পদক পায়নি কেন? সেও ভুলে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রকাশকে না খেলানোর জন্য। খেলালে ভারত অবশ্যই পদকের লড়াইয়ের মধ্যে থাকত এবং একটি পদকও পেত।

যাই হোক, এডমন্টনে প্রকাশ পাড়ুকোন প্রমাণ করেছে যে, কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সে-ই ব্যাডমিন্টনের সম্রাট। কোয়ার্টার ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের ব্রায়ান পারসারকে হারায় ১৫—১ ও ১৫—৮ পয়েন্টে, সেমি ফাইনালে ইংল্যান্ডের চ্যাম্পিয়ন রে স্টিভেনসকে আরও সহজে, ১৫—০ ও ১৫—৭ পয়েন্টে এবং ফাইনালে ইংল্যান্ডের নামী খেলোয়াড় ডেরেক ট্যালবটকে ১৫—৯ ও ১৫—৮ পয়েন্টে হারিয়ে প্রকাশ চ্যাম্পিয়ন হয়। ক্রাইস্টচার্চে এই ট্যালবটের কাছেই প্রকাশকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনালে। এবার সেই ট্যালবটকে এক রকম নাচিয়ে নাচিয়ে প্রকাশ বিজয়ী হয়েছে। খেলার ফলগুলিই বলে দিচ্ছে প্রকাশ এখন কত উন্নত ও পরিমার্জিত খেলোয়াড়। তার স্ম্যাশ, স্লেসিং, ড্রপশট অ্যাঙ্গেল শট, কিছুরই মোকাবিলা করতে পারেনি পৃথিবীর তিন নামী খেলোয়াড় পারসার, স্টিভেন্স ও ট্যালবট।

অবশ্য টানা সাতবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন তেইশ বছর বয়সী প্রকাশ পাড়ুকোন অনেকদিন থেকেই আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন ক্ষেত্রে এক গালভরা নাম। পৃথিবীর প্রথম সারির বহু খেলোয়াড়কে হারিয়েছে, আবার নিজেও হেরেছে শেষ রক্ষা করতে না পেরে। সুইডেনের স্বেন প্রী, ফ্লেমিং ডেলফস, ইন্দোনেশিয়ার ইলি সুমিরাত, লিয়েম সুই কিং প্রমুখ কৃতী খেলোয়াড়ের সঙ্গে বহু স্মরণীয় ব্যাডমিন্টন সংগ্রামে প্রকাশকে একটুর জন্য হার স্বীকার করতে হয়েছে। বহু খেলায় মীমাংসা-সূচক তৃতীয় গেমে এগিয়ে থেকেও। ম্যাচ পয়েন্টের মুখে এসে হেরে যাওয়ার বড় নজির ১৯৬৭-এ নেহরু ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে। তাইল্যান্ডের বান্দিত জইয়েনের বিরুদ্ধে তৃতীয় গেমে ১৭—১৪ পয়েন্টে এগিয়ে গিয়েও হেরে গিয়েছিল ১৭—১৮ পয়েন্টে। মাত্র একটি পয়েন্ট তাকে বিমুখ করেছিল বড় খেতাব থেকে। অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে, টমাস কাপে, বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে এবং বহু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতার পর এবারই ব্যাডমিন্টনের বড় সম্মান পেল এডমন্টনে।

ভারতের দুই ভারোত্তোলক করুণাকরন ও সেলভান কিন্তু প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতেই বড় সম্মান পেয়েছে। দেশের জন্য সোনা-রুপো জিতে এরা আর কী পেয়েছে জানো? খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণাটক সরকার প্রকাশের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। প্রকাশ কর্ণাটকের ছেলে। ভারতের রেলমন্ত্রী মধু দন্ডবতে করুণাকরন ও সেলভানের পদোন্নতির আদেশ দেন। দুজনই রেলের কর্মী।

এডমন্টনে অন্যান্য দেশের অনেকেই তারকা হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকার নাম গ্রাহাম স্মিথ। সে কানাডার ছেলে। সাঁতারে পেয়েছে ছয়টি সোনার পদক। এডমন্টনে বিশ্ব রেকর্ড হয়েছে মাত্র একটি। সেটিও সাঁতারের ৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে। রেকর্ড করেছে অস্ট্রেলিয়ার পনেরো বছরের মেয়ে ট্রেসি উইকহাম।

সানি খেলছে, রেকর্ড ভাঙছে

বাষট্টি ইঞ্চি লম্বা সুনীল গাভাসকর প্রথম টেস্ট ইনিংসে রান করেছিলেন পঁয়ষট্টি, দ্বিতীয় ইনিংসে দুই বেশি—সাতষট্টি নট আউট। তার পর দেখতে দেখতে সাত বছর কেটে গেছে, চুরচুর করে ভেঙেছে একের পর এক রেকর্ড। ঐ উনিশশো একাত্তরে গাভাসকরের রানের ঝড় এমনই প্রচণ্ড হয়ে ওঠে যে, বারবার হতচকিত সোবার্স ক্যাচ ফেলেন সুনীলের। শেষ পর্যন্ত সোবার্স তো বলেই ফেললেন, "ভাই, এই ক্যাচটাচগুলো একটু অন্যদিকে তুললে হয় না?"

একদিন খেলার আগে সোবার্স গাভাসকরের ব্যাট ছুঁয়ে ঠাট্টা করে বললেন, "এই তোমার ব্যাট ছুঁয়ে দিলাম, আর বড় রান পাবে না।" কিন্তু তুকতাকে কি রানের ঝড় থামে! ঐ টেস্ট সিরিজে গাভাসকরের রান : ৬৫, ৬৭ নট আউট, ১১৬, ৬৪ নট আউট, ১ ও ১১৭ নট আউট, ১২৪ এবং ২২০। মোট ৭৭৪, গড় ১৫৪·৮০।

টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে জীবনের প্রথম সিরিজে এত রান পৃথিবীর কোনো ক্রিকেটার করেননি। এর আগের রেকর্ড ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের 'কালো ব্রাডম্যান' জর্জ হেডলির ৭০৩, ১৯২৯-৩০ মরশুমে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। এর আগে অথবা পরে পৃথিবীর কোনো ওপেনিং ব্যাটসম্যান একই সিরিজে এত রান করেননি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে করা হার্বার্ট সাটক্লিফের সাত-চল্লিশ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙেছেন গাভাসকর।

গাভাসকর এ পর্যন্ত সাঁইত্রিশটি টেস্টে পেয়েছেন তেরটি সেঞ্চুরি। গড়ে একটি সেঞ্চুরির জন্য তিনটি টেস্টও লাগেনি। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এত ভাল আনুপাতিক রেকর্ড আর কারও নেই।

আর, ভারতীয় রেকর্ড কত যে গুঁড়িয়ে গেল! গাভাসকর ছাড়া আর কোনো ভারতীয় এক সিরিজে সাতশো রানে পৌঁছননি। গাভাসকরই একমাত্র ভারতীয়—একই সিরিজে যাঁর নামে লেখা হয়েছে চারটি শতরান। আর কোনো ভারতীয় ক্রিকেটার পারেননি একই টেস্টে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি এবং ডাবল সেঞ্চুরি করতে। এত বেশি টেস্ট সেঞ্চুরি (১৩) আর কোনো ভারতীয়র ব্যাট থেকে আসেনি। আর কেউ এক বছরে এক হাজার টেস্ট রান পাননি। উনিশশো ছিয়াত্তরের চব্বিশে জানুয়ারি থেকে বাইশে ডিসেম্বরের মধ্যে এগারটি টেস্টে গাভাসকরের রান ছিল এক-হাজারের চেয়ে চব্বিশ বেশি।

আপাতত গাভাসকর তাকিয়ে আছেন পল্লি উম্রিগড়ের একটি বড় রেকর্ডের দিকে। উনষাটটি টেস্টে উম্রিগড়ের তিন হাজার ছ'শো একত্রিশ রান—এ পর্যন্ত ভারতীয় রেকর্ড। এই রেকর্ড ভাঙার জন্য গাভাসকরের দরকার আর মাত্র চারশো ছয় রান। সানি এখন ভাল ফর্মে সামনে এত টেস্ট—রোখে কে?

ফাইটার

আপ্পা রাও

১৯৫৩ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল শুরু হতে তখনও চল্লিশ মিনিট বাকি। লড়বে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়া কালচার লীগ আর ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গল টেন্টের এক কোণে হাঁটুতে মাথা রেখে কাঁদছে একজন ফুটবলার। কে? কেন?

এমনিতেই ইস্টবেঙ্গলের টীম দারুণ, তার ওপর এসেছেন দুই পাকিস্তানী ফুটবলার—নিয়াজ এবং মাসুদ ফকরি। ফকরিকে দেখতে সাহেবের মতো এবং তুখোড় লেফট উইঙ্গার। সুতরাং বাদ পড়লেন এতদিনের বিখ্যাত যোদ্ধা লেফট উইঙ্গার সালে। কে এবং কেন, তার উত্তর পাওয়া গেল।

কিন্তু গল্প শেষ হয়নি। আপ্পা রাও জ্যোতিষ গুহকে সরাসরি বললেন, "আমি আটবার আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে খেলেছি। তাছাড়া, সালে আমার চেয়ে কম বয়সী। আপনি আজ ওকেই খেলান।"

এই হলেন আপ্পা রাও, যিনি প্রতি বছর অন্ধ্রপ্রদেশের আনাপার্ত্তি থেকে কলকাতায় আসতেন মনমাতানো ফুটবল খেলতে।

১৯৪১ সালে কালীঘাট থেকে ইস্টবেঙ্গলে আসার পর একটানা ১৪ বছর খেলেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তাঁর মতো খেলা তৈরি করার ফরোয়ার্ড ভারতবর্ষে আর দেখা যায়নি।

আপ্পা রাও কত বড় ফুটবলার ছিলেন? রেকর্ড বুক বলছে, ১৯৪৮ বা ১৯৫২ সালের অলিম্পিকে ভারতীয় দলে তিনি ছিলেন না। প্রথমবার বাদ পড়েন অসুস্থতার অজুহাতে, দ্বিতীয়বারের কারণ বয়স।

কিন্তু আপ্পা রাওয়ের সঙ্গী ফুটবলাররা কী বলেন? যে আমেদ খাঁন অনেকেরই মতে শ্রেষ্ঠ এবং বেপরোয়া, যিনি অন্য ফুটবলারদের গালাগালিতে জর্জরিত করতেন—তিনিও আপ্পা রাও ভুল পাস করলে মিটিমিটি হাসতেন। আপ্পা রাওয়ের ভুল! ইস্টবেঙ্গল টেন্টে টাঙানো আপ্পা রাওয়ের ছবি ভাই সারমাদকে দেখিয়ে আমেদ বলেছিলেন, "প্রণাম কর, আমারও গুরু!"

তপু দাশগুপ্ত

ইস্টবেঙ্গল আবার উঠে আসছে

শ্যামসুন্দর ঘোষ

ইস্টবেঙ্গল বরাবরই লড়িয়ে দল। এই দলের খেলোয়াড়দের সংগ্রামী মনোভাবের ছাপ ফুটে উঠেছে বারবার, বিশেষ করে বিদেশী দলগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। তবে এ বছর বরদলুই ফাইনালের আগে ক্লাব-সমর্থকদের মনে দ্বিধা ছিল—ইস্টবেঙ্গল কি ব্যাংককের পোর্ট অথরিটিকে হারাতে পারবে! কারণ, দলের রক্ষণভাগের যে খেলোয়াড়টি এ বছর সবচাইতে বেশি সুনাম কুড়িয়েছেন সেই মনোরঞ্জন অনুপস্থিত ছিলেন ফাইনালে।

বিদেশী দলটির ফাইনালে প্রবেশ ঘটেছে সহজেই, অথচ আসাম পুলিসের মতো দলটির বিরুদ্ধে সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের ক্রীড়াধারা ছিল নেহাত সাদামাটা। যদিও দ্বিতীয় দফার খেলায় সাবির আলি হ্যাটট্রিক করেছেন। ব্যাংককের এই দলটির সাফল্য সুনিশ্চিত হয়েছিল তখনই, যখন তাঁরা গত বছরের ফেডারেশন কাপ জয়ী ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাস্ট্রিজকে দ্বিতীয় দফার সেমি ফাইনালে পরাজিত করেন ৪—১ গোলে। এই খেলাটি হয়েছিল ফাইনাল খেলার আগের দিন। খেলাটি

হরজিন্দর সিং

ডোভড উইলিয়ামস

সাবির আলি

সুরজিৎ সেনগুপ্ত

দেখে নেহরু স্টেডিয়ামে উপস্থিত অনেক দর্শকের মনেই ইস্টবেঙ্গলের সাফল্য সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল জয়ী হয়েছে। আর সেই জয় এসেছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরে। দর্শকরা খেলায় ওঠা-পড়ার উত্তেজনা উপভোগ করেছেন প্রবলভাবে। গোলের সংখ্যা ছিল ছটি। গোল সংখ্যাই প্রমাণ করে যে, খেলাটি ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত।

কারও-কারও হয়তো মনে হয়েছিল যে, এই খেলায় বিদেশী দলটিই জিতে যাবে। কারণ, বিরতি পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল পিছিয়ে ছিল ১—২ গোলে। আর খেলার ফলাফল যখন ২—২ তখন পোর্ট অথরিটি একটি পেনাল্টিও পেয়েছিল। কিন্তু ভাস্কর গাঙ্গুলির তৎপরতায় পোর্ট অথরিটির পক্ষে গোল করা সম্ভব হয়নি। ভাস্কর পেনাল্টি বাঁচিয়েছেন, কিন্তু দলের দ্বিতীয় গোলটির জন্য তাঁকে দায়ী করা যেতে পারে।

খেলা শেষ হতে যখন মিনিট চারেক বাকি তখন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক সুরজিৎ সেনগুপ্ত দর্শনীয়ভাবে গোল করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান। খেলা ভাঙার কয়েক সেকেণ্ড আগে শেষ গোলটি দেন মিহির বসু। মিহির ও সুরজিৎ দুজনেই দুটি করে গোল করেছেন তবু দলকে উজ্জীবিত করার মূলে রয়েছে অধিনায়ক সুরজিতের বুদ্ধিদীপ্ত ক্রীড়াধারা। দল যখন ১—২ গোলে পিছিয়ে তখন ফলাফলের সমতা আনেন সুরজিৎ।

এ বছর কোয়েম্বাটুরে ফেডারেশন কাপে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের যে উন্নত ক্রীড়াধারা দেখেছিলাম তার সিকিভাগও কলকাতা ফুটবল লীগে দেখতে পাইনি। হয়তো প্রথম দিকের ব্যর্থতা দলের মনোবলে আঘাত হেনেছিল। ঘরোয়া ফুটবল লীগে তিন-চার পয়েন্ট নষ্ট করা কম কথা নয়।

খেলায় জয়-পরাজয় আছে, কিন্তু খেলোয়াড়রা তাদের স্বাভাবিক দক্ষতা হারাবে কেন? আর, কলকাতার ফুটবল লীগে ব্যর্থতার পর ইস্টবেঙ্গল হঠাৎ এত ভাল খেলা খেলল কী ভাবে? তবে কি আন্তঃরাজ্য ফুটবলে ভিন্ন রাজ্যের নামী খেলোয়াড়রা দলে আসায় দলের মনোবল বেড়েছে? পাঞ্জাবের হরজিন্দর, তামিলনাড়ুর ডেভিড উইলিয়মস, কর্নাটকের লিংকম্যান দেবরাজ, ডিপ-ডিফেণ্ডার ম্যাথিউস ইতিমধ্যে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে চুক্তি-বদ্ধ হয়েছেন। অবশ্য আগামী বছর ৩১ মার্চের আগে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে তাঁরা খেলতে পারবেন না।

ভিন্ন রাজ্যের একাধিক খেলোয়াড় এ রাজ্যের বিভিন্ন দলে যোগ দেওয়ায় ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড়রা ভাল খেলার প্রেরণা পাবেন আশা করা যায়। ফুটবল এ-রাজ্যের খেলা। আর সেই খেলায় এখনও পশ্চিম বাংলা যে শ্রেষ্ঠ তার প্রমাণ, গত তিন বছর বাংলার জাতীয় ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়েছে এই রাজ্য।

গত বছর ফেডারেশন কাপ ও কলকাতা ফুটবল লীগে ব্যর্থতার পর বরদলুই ট্রফিতে সাফল্যের মাধ্যমেই মোহনবাগানের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। তার প্রতিফলন লক্ষ করা গেছে আই এফ এ শীল্ড, ডুরাণ্ড ও রোভার্স জয়ে। এমন কী কসমসের মতো শক্তিশালী দলের সঙ্গেও মোহনবাগান খুব ভাল খেলেছিল।

শীল্ডের সেমি-ফাইনালেও আরারাতের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল একেবারে বাঘের মতো লড়ে গেল। রুশ দল জিতল বটে, কিন্তু সহজে নয়। আমার ধারণা, ইস্টবেঙ্গল আবার জোর কদমে উঠে আসছে।

ইস্টবেঙ্গলের সাফল্য আগামী দিনের জয়যাত্রা ঘোষিত করবে কি না তার প্রমাণ মিলবে ডুরাণ্ড ও রোভার্স কাপে, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী এ-রাজ্যের দলগুলি।

আলি আবার সম্রাট

সুব্রত সরকার

ষোল বছর আগে তোমাদের অনেকেরই হয়ত জন্ম হয়নি।

গত মাসে নিউ অরলিনসে ১৫ রাউন্ডের লড়াইয়ে মহম্মদ আলি লিয়ন স্পিঙ্কসকে ভালমতন পয়েন্টের ব্যবধানে হারাবার দিন তিন-চার আগে ১৯৬২'র খবরের কাগজের ফাইল উল্টাচ্ছিলাম। সেবারে সেপ্টেম্বর মাসে সনি লিস্টন ফ্লয়ড প্যাটারসনকে প্রথম রাউন্ডে নক-আউট করে নতুন বিশ্ব হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তবে শিকাগো থেকে ২৭ তারিখে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদসংস্থার এক নামহীন সাংবাদিকের রিপোর্টে আশঙ্কা করা হয়েছে, ওইরকম এক-তরফা লড়াই হলে হেভিওয়েট বক্সিং আর দর্শকদের আকৃষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু রিপোর্টের শেষের দিকে লেখা:

"হেভিওয়েট বক্সিংকে যদি লোকেদের কাছে আবার বড় আকর্ষণ হতে হয়, তবে তার জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনতে পারেন তরুণ ক্যাসিয়াস ক্লে...ক্লে এখনও অপরাজিত, গড়নে বিশাল আর শক্তিমান। তাঁর বয়স মাত্র ২০। ক্লের নিজের বিশ্বাস, সময়কালে তিনি আরও বড়সড় আর শক্তিমান হবেন। তাছাড়া ক্লে খুবই দ্রুত আর সজোরে ঘুঁষি মারতে পারেন...

ষোল বছর আগে লেখা। এর লেখক এখন কী ভাবছেন? আমরা আলিকে প্রথমে ক্যাসিয়াস মার্সেলাস ক্লে বলেই জানতাম। ১৯৬৪'র ২৫শে ফেব্রুয়ারি মিয়ামি বীচ শহরে তিনি যখন সপ্তম রাউন্ডের টেকনিকাল নক-আউটে সনি লিস্টনকে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন, তখনও তাঁর নাম সরকারীভাবে ক্লে-ই ছিল—যদিও লড়াইয়ের কিছুদিন আগেই তিনি ব্ল্যাক মুসলিম দলে যোগ দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তবে বিরূপ পাবলিসিটির ভয়ে লড়াইয়ের প্রযোজকরা এই খবরটি আগে চাউর হতে দেননি।

লিস্টনের সঙ্গে সেই প্রথম লড়াইয়ের সময় চ্যাম্পিয়নের ওজন ছিল ২১৮ পাউন্ড, আর ক্লে'র ২১০½—তখন তাঁর ক্যারিয়ারে সর্বোচ্চ। তবে ক্লে লিস্টনকে পরাস্ত করেন নিজের স্পীডের উপর ভিত্তি করে।

লিস্টনের সঙ্গে ফিরতি লড়াইয়ের আগে ক্লে প্রথমবার বিয়ে করেন: পাত্রীর নাম সোঞ্জি রয়, বয়স ২৪, পেশা মডেলিং; তারিখ ১৯৬৪'র ১৬ই আগস্ট। তবে পরের বছর মে মাসে লিস্টনকে প্রথম রাউন্ডের নক-আউটে হারাবার কিছুদিন বাদেই এই বিয়ে ভেঙে যায়, আর পরে ডিভোর্স হয়।

সেই প্রথমবার তো ক্লে—তখন সরকারীভাবে মহম্মদ আলি—লড়াইয়ে না হেরেই বিশ্ব খেতাব হারিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয়বার ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ হয় জাইরের রাজধানী কিনশাসায়: ১৯৭৪'র ৩০শে অক্টোবর। চ্যাম্পিয়ন জর্জ ফোরম্যানের ওজন তখন ২২০ পাউন্ড, আলির ২১২। ফোরম্যানের ঘুঁষির দারুণ জোর, কিন্তু অনুশীলনের সময় আলি ভালমতন শিখে নিয়েছিলেন যে, কীভাবে রিঙের দড়ি

ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সেই মারের 'শক' সারা দেহময় বিস্তারিত করে নিজের মনকে পরিষ্কার রাখা যায়। ফোরম্যান অষ্টম রাউন্ডের নক-আউটে হার স্বীকার করলেন।

দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হবার সময়ে আলির স্ত্রী ছিলেন খালিনা (আগের নাম বেলিন্ডা বয়েড)—তবে দুই বছর বাদে তাঁদের নয় বছরের বিবাহ-বন্ধন ভেঙে যায়। আর এবার আলি তৃতীয়বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সময় তাঁর তৃতীয় স্ত্রী ভেরোনিকা।

ফেব্রুয়ারিতে স্পিঙ্কসের কাছে আলির পরাজয় খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল; নিউ অরলিনসের লড়াইয়ে আলিই ছিলেন ফেভারিট। তাই তাঁর জেতাতে সত্যিই কেউ অবাক হয়নি। ১৫ই সেপ্টেম্বরের ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন স্পিঙ্কসের ওজন ছিল ২০১ পাউন্ড, আলির ২২১। ১৪ বছরে আলির স্পীড কিছুটা কমেছে বটে, তবে স্পিঙ্কসকে হারানোর জন্য তাঁর ট্যাকটিকসই যথেষ্ট ছিল। স্পিঙ্কসই তো হেরে যাবার পর বলেন, "আমার দেহ প্রস্তুত ছিল, আমার মন প্রস্তুত ছিল না।"

আলি এবার কী করবেন?

একটা জিনিস কিন্তু তিনি চিরকাল করে যাবেন। তাঁর বাল্যকালের হীরো, পাঁচবারের বিশ্ব মিডলওয়েট চ্যাম্পিয়ন সুগার রে রবিনসনের করমর্দন করবার জন্য তখনকার ক্যাসিয়াস ক্লে একবার বৃষ্টিতে ঘন্টা তিনেক অপেক্ষা করেছিলেন; রবিনসন কিন্তু কারুর জন্য না থেমেই তাড়াতাড়ি পাশ দিয়ে চলে যান। মহম্মদ আলি তাই তাঁর ভক্তদের কথা সবসময় মনে রাখেন : বৃষ্টির মধ্যে হোক, রঙ্গশালায় হোক, ঢাকায় হোক, মস্কোয় হোক—মহম্মদ আলি হ্যান্ডশেক করবার জন্য সদাসর্বদা হাত বাড়িয়ে রাখেন। বিশ্বময় হেভিওয়েট বক্সিংকে তিনি জনপ্রিয়তার যে-স্তরে নিয়ে গেছেন, তার কথা ষোল বছর আগে কেউ কল্পনাই করতে পারেনি।

ফোটো অলক মিত্র

খেলার মাঠে নতুন মুখ

পুষ্পেন সরকার

প্রতি বছরেই ফুটবল মরশুমে কয়েকজন তরুণের খেলা চোখে পড়ে। দু-এক বছরের মধ্যেই তারা বড় দলে যোগ দেওয়ার ডাক পায়। প্রথম দিকে অবশ্য নিয়মিত সুযোগ পায় না। পরে দু-চারটি খেলা ভাল খেললে অনেক সময় দলের অপরিহার্য খেলোয়াড় হয়ে পড়ে। খবরের কাগজে নাম ও ছবি ছাপা হয়। তোমরা পড়ো। আস্তে আস্তে ঐ সব নাম-না-জানারা তোমাদের মনে দাগ ফেলে। আপন হয়ে যায়।

এ-বছরের ফুটবল মরশুমে কয়েকটি নতুন মুখের কথা তোমাদের বলব। আমার বিশ্বাস, আগামী দু-চার বছরের মধ্যেই এরা তোমাদর কাছে খুব পরিচিত হয়ে উঠবে।

মহমেডান স্পোর্টিং দলের তিন খেলোয়াড়—নাসির আমেদ, খাবাজী ও অমলরাজের খেলা অনেকেরই চোখে পড়েছে। নাসির গোলে খেলে। লম্বা, দোহারা চেহারা। প্রথম দিকে তেমন আত্ম-বিশ্বাস নিয়ে খেলতে পারেনি। কয়েকটি খেলার পর বেশ ভাল খেলেছে। খাবাজী ও অমলরাজ দুজনেই কলকাতায় প্রথম খেলছে। অমলরাজ হাফব্যাকে খেলে। খাবাজী লেফট হাফ বা লেফট্ স্ট্রাইকার দুই জায়গাতেই খেলতে পারে। অমলরাজের থেকেও খাবাজীর সম্ভাবনা উজ্জ্বল। খুব পরিশ্রমী খেলোয়াড়।

খিদিরপুরের লেফট হাফ স্বপন নন্দী, দুই স্ট্রাইকার অমিত বাগচি ও বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য এবং লেফট্ আউট ডেনিস উইলিয়ামসনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। সকলেই তরুণ। ভাল স্বাস্থ্য। উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পেলে নাম করবে।

ইস্টবেঙ্গলের স্ট্রাইকার তপন দাস আর একজন ভাল খেলোয়াড়। প্রথম দিকে অবশ্য খেলার সুযোগ পায়নি। এরিয়ান থেকে এসেছে। সুযোগ পেয়েই নিজের প্রতিভা দেখিয়েছে। কিন্তু সাব্বির আলি আসার জন্যে নিয়মিত খেলার সুযোগ পাচ্ছে না। মিহির ও তপনের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। তপন আরও নাম করবে। বুদ্ধি দিয়ে খেলে।

রক্ষণভাগের বাকি খেলোয়াড়দের মধ্যে হাওড়া ইউনিয়নের রাইট হাফ প্রসন্ন ঘোষ, জর্জ টেলিগ্রাফের রাইট হাফ রবি রায় এবং ভ্রাতৃ সঙ্ঘের লেফট ব্যাক নরেন দত্ত ভাল খেলেছে। রক্ষণ-কাজে সহায়তা ছাড়া পুরোভাগকে সময়মতো বল জুগিয়ে দলের আক্রমণে সাহায্য করে থাকে। নরেনের খেলায় একটু শক্তির প্রকাশ বেশি। কিছুটা পরিমার্জিত হলে উন্নতি করবে।

ফরোয়ার্ডের খেলোয়াড়দের মধ্যে রাইট স্ট্রাইকার হিসাবে উয়াড়ির উত্তম চক্রবর্তী, সালকিয়ার রণজিৎ চ্যাটার্জি, ভ্রাতৃ সঙ্ঘের অমিয় মুখার্জি অধিকাংশ খেলাতেই সাফল্য দেখিয়েছে। উত্তমের শুটিং ভাল। সুযোগ পেলেই গোল করতে পারে। তিন-জনই মাথা খাটিয়ে খেলে। লেফট আউট হিসেবে হাওড়া ইউনিয়নের প্রদীপ মিত্রের নাম অবশ্যই করতে হবে। এ-ছাড়া ছোট দলগুলির মধ্যে আরও দু চারজন খেলোয়াড় আছে যারা মাঝে মাঝে বেশ ভাল খেলেছে। আশা করা যায়, আগামী মরশুমে এরা আরও বড় হয়ে উঠবে।

উন্নতির পথে বাধাও অনেক। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সাধনা থাকলে ও সুযোগ পেলে বড় হওয়ার পথ সহজ হয়ে ওঠে। খেলোয়াড়োচিত মনোভাব এবং চরিত্র পথের বাধা অনেকটা দূর করে।

শীল্ড থাকল কলকাতায়

অশোক দাশগুপ্ত

ফোটো প্রিয়রঞ্জন রক্ষিত

আরারাত মহমেডান স্পোর্টিংকে দাঁড় করিয়ে চার গোলে হারানোর পরদিন সকালে পি কে ব্যানার্জির অফিস ঘরে বসে শিবাজী ব্যানার্জি টেবিলে টোকা মেরে বলেছিলেন, "আই এফ এ শীল্ড বাইরে যাবে না।" যায়নি। ফাইনালে মোহনবাগান জিততে পারেনি, কিন্তু ক্যাপ্টেন প্রসূন ব্যানার্জি টসে জিতে প্রথম ৬ মাসের জন্য ট্রফি ঢুকিয়েছেন মোহনবাগান টেন্টে। আরারাত আর ৬ মাস পর শীল্ড নিতে আসবে না। কিন্তু টসে জিতলে হয়ত শীল্ড উড়ে যেত রাশিয়ায়। আমরা তো খুব চিন্তায় ছিলাম। যা ঠান্ডা রাশিয়ায়, গরম দেশের শীল্ডের বড় কষ্ট হত! মোহনবাগান তা হতে দিল না।

শীল্ড ঘরে রাখার জন্য কলকাতার ছেলেদের লড়াই ঠিক-ঠাক শুরু হয়েছিল ১৪ সেপটেমবর বিকেল তিনটে সাতচল্লিশ মিনিটে, যখন মিলিখিয়ান বাবকেনের পায়ের ওপর জীবন তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ভাস্কর গাঙ্গুলি। আর তার ঠিক চার মিনিট পর সুরজিতের দুর্দান্ত ডজে যখন অসহায় হলেন আজারিয়ান, মাঠভর্তি দর্শক বুঝে নিলেন- এই টীমকে রোখা তো যায়ই, চেষ্টা করলে আক্রমণে তছনছও করে দেওয়া যেতে পারে।

খেলার আগের দিন সকালে ভাস্কর, চিন্ময়, সুরজিৎ, প্রশান্ত, সত্যজিৎ, শ্যামল -সকলেই বলেছিলেন "লড়ব"। ওঁরা লড়েছেন। কিন্তু যিনি ছিলেন একদম চুপচাপ, সেই মিহির বসু লড়েছেন সবার চেয়ে বেশি। ইস্টবেঙ্গল দেওয়ালে পিঠ দিয়ে যুদ্ধ করে হার মানল খেলা শেষের চার মিনিট আগে।

ঐ দেওয়ালে পিঠ দিয়েই খেলা শুরু করেছিল মোহন-বাগান। চার ব্যাক ছাড়াও ছিলেন 'সুইপার' সুব্রত ভট্টাচার্য— পেনাল্টি বক্স থেকে যাবতীয় উপদ্রব ঝেঁটিয়ে বিদায় করাই যাঁর কাজ।

কিন্তু আট মিনিটের মাথায় শিবাজীর অসতর্কতায় গোল খেল মোহনবাগান। একে তুমুল বৃষ্টি, তার ওপর এই গোল, সারা মাঠ ঠান্ডা হয়ে গেল। শিবাজীর দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, "তবে যে তুমি বলেছিলে.....!"

এরপর শিবাজী বোঝালেন, আর কোনো ভুল করতে তিনি রাজি নন। সাহেবরা অবাক হয়ে দেখলেন, কোথায় গোল খেয়ে চুপসে যাবে তা নয়, পালটা আঘাতে জ্বলে উঠল মোহনবাগান। এবং তারপরের পঁয়ত্রিশ মিনিট, ভারতীয় ফুটবল তার সমস্ত সৌন্দর্য ঐশ্বর্য এবং সংগ্রামে ঝলমল করে উঠল। মোহনবাগান

ডিফেন্সের দুই ধারে তখন দুই সময়ের সূর্য। শ্যামলের খেলায় ছিল মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রচন্ড দাপট, আর সুধীরের খেলায় অস্তগামী সূর্যের মায়াবী আলো। মাঝখানে প্রদীপ আর সুব্রতর ভাবখানা এই ঃ যা কিছু করার বাইরে করো. আমাদের পেনাল্টি এলাকায় বলের 'প্রবেশ নিষেধ'।

মাঠ তখন বৃষ্টিতে ভারী, গৌতম খেলে চললেন ও'র সংগ্রামী ফুটবল. যা ফুটবল মাঠকে সম্ভ্রান্ত যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা দিয়েছিল। ক্যাপ্টেন প্রসূন প্রথম দিকে খেলা বোঝার চেষ্টাতেই খেলা থেকে খানিকটা দূরে ছিলেন। কিন্তু, কয়েক মিনিট পেরোতেই ওঁর বাঁ পা চলেছে ধারালো ছুরির মতো। সেই ছুরির ছোট-ছোট টানে এলোমেলো আরারাতের সাজানো ছক. কিন্তু সেই ছক হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল মোহনবাগানের দুই কাঁচ ডানার ভয়ঙ্কর ঝাপটে। বিদেশ মাঠে নেমেই সেই কাজটি করলেন, যার জন্য তাঁর এত আদর। দুদ্দাড় করে ঢুকে পড়লেন আরারাতের সীমানায়। এবং পাসটিও বাড়ালেন নিখুঁত। শ্যাম থাপা বলটিকে সহজতর করে দিলেন হাবিবের সামনে। এবং তারপরই শ্যাম জড়িয়ে ধরলেন হাবিবকে. যেমন করে হাবিব ওঁকে জড়িয়ে ধরেছিলেন ৬ আগস্টের লীগ ম্যাচে।

হাবিবের শট ধরেছেন আরারাতের গোলকীপার

কিন্তু বিদেশ আর হাবিবের কাজ তখনও শেষ হয়নি। আবার বল বাড়ালেন বিদেশ। হাবিব দিলেন সোনার জলে ডোবানো অনবদ্য থ্রু। তারপর? ডান দিকে যিনি ছটফট করছিলেন আরারাত ডিফেন্স ছিন্নভিন্ন করার জন্য, তাঁর সামনে সুযোগ এল। মানস বল পেয়েই নির্ভুল জায়গায় গিয়ে গোলকীপারকে টেনে আনলেন। এবং তারপর. যেভাবে গোলে বল পাঠালেন, মনে হল. এমন গোল তিনি যেন একশোতে একশোবার করতে পারেন।

সেই মুহূর্তে সারা গ্যালারিতে উড়ছে মোহনবাগানের পতাকা, কিন্তু সেই পতাকার রঙ মেরুন-সবুজ হলেও তাতে জ্বলজ্বল করছে একটি কথা ঃ 'ভারতীয় ফুটবল'।

কিন্তু ততক্ষণে বৃষ্টির মধ্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দর্শকদের গলা ব্যথা। মোহনবাগান ফুটবলাররাও দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরু করলেন একটু ঢিমেতালে। অনবদ্য গোল করলেন আগানেশিয়ান খোরান, তিনি বল ধরলেই গ্যালারিতে ভয় ঢোকে. "এই রে. আবার দশ নম্বর।"

খেলা শেষ। সুভাষ ভৌমিক দৌড়ে মাঠে ঢুকে একে-একে জড়িয়ে ধরলেন ঘাম আর কাদামাখা ফুটবলারদের।

লীগ ম্যাচের কথা লেখার সময় বলেছিলাম. তোমাদের প্রিয় ফুটবলার দাদাদের মতো মাঠে নামতে দেরি করে নিজেদের অপমান এবং দর্শকদের বিরক্ত কোরো না। আর আজ বলছি. ঐ দাদাদেরই একজন, সুভাষ ভৌমিকের কাছে একটা বড় জিনিস শিখে নাও। সারা ময়শুম চুটিয়ে খেলেও সুভাষ শীল্ডে বাদ পড়েছেন টীম থেকে। খেলেছেন মানস। অত সিনিয়র খেলোয়াড় সুভাষ যখন খেলার পর মানসকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানালেন. আমার মতো কাঠখোট্টা লোকের চোখের কোণেও তখন জল। এই হচ্ছে টীম স্পিরিট। মানসের অনবদ্য গোল অনেক দিন মনে থাকবে. তার চেয়েও হয়তো বেশিদিন মনে থাকবে সুভাষ ভৌমিকের উষ্ণ আলিঙ্গনের কথা।

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রীয় সমাচার

মণিমেলা কুইজ প্রতিযোগিতার ফাইনাল সম্প্রতি জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় কুড়িটি দল অংশ নেয়। শীর্ষস্থান পেয়েছে যাদবপুর কলোনি মণিমেলা। প্রথম ও দ্বিতীয় রানার্সআপ হয়েছে যথাক্রমে কসবা মণিমেলা ও বেহালার দক্ষিণ পল্লী মণিমেলা।

মণিমেলা মহাকেন্দ্রের নিয়মিত শাখাকেন্দ্রগুলি ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস ও শ্রীঅরবিন্দের জন্মোৎসব পালন করে। এই উপলক্ষে মণিমেলাগুলি প্রভাতফেরি, পতাকা-উত্তোলন, শহীদ-স্মরণ, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া-অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করেছিল। মণিভাইবোনেরা রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানটিও পালন করে।

আঞ্চলিক সংবাদ

সম্প্রতি কল্যাণী আঞ্চলিক প্রাকনায়ক শিক্ষণ-শিবিরে কর্মীদের শারীরিক ও সাংস্কৃতিক নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। ২৩ থেকে ৩০ জুলাই নৈহাটি অঞ্চলের মণিমেসাগুলির জন্য খো-খো ও কুচকাওয়াজ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে দুটি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। কল্যাণী অঞ্চলের মণিমেলাগুলি সম্প্রতি প্রশাসনিক ভবন-মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মণিসংবাদ

নবদ্বীপের পঞ্চবটী মণিমেলার ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসব গত ১ জুলাই পালিত হয়। গার্ডেনরীচের আদর্শ মণিমেলার ৩৮তম প্রতিষ্ঠা-দিবস পালিত হয়েছে সম্প্রতি। গোবরডাঙার শরৎস্মৃতি মণিমেলার পুরস্কার বিতরণী উৎসব গত ১৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। বার্নপুরের আনন্দ মণিমেলা সম্প্রতি তাদের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। হাওড়ার পল্লীমঙ্গল পালন করেছে 'নবীন বরণ' উৎসব।

কলকাতার ইণ্টালি মণিমেলা আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই মণিমেলার নেটবল ও রিলেকল টুর্নামেন্ট তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে শেষ হয়। জগদ্দলের নব-মিতালি মণিমেলা এক বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। মধ্যমগ্রামের মহাভারতী মণিমেলা ও বীরভূমের জয়দুর্গা মণিমেলা সম্প্রতি দুটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। কলকাতার সূর্য মণিমেলার প্রযোজনায় একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রতি।

বসিরহাটের রত্নরবি মণিমেলা দেওয়াল-পত্রিকা ও অন্যান্য শিল্পকাজের প্রদর্শনীর জন্য একটি স্থায়ী গ্যালারি স্থাপন করেছে। বেহালার বৈশাখী মণিমেলা শহীদ দিবস উপলক্ষে একটি গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে। শ্যামনগরের আতপুর বৈশাখী মণিমেলা সম্প্রতি একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। এই মণিমেলায় শহীদ-স্মরণ দিবসও পালিত হয়। কৃষ্ণনগরের দ্বিজেন্দ্র মণিমেলা সম্প্রতি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর নাটকের অংশবিশেষ ও দ্বিজেন্দ্রগীতি পরিবেশন করে।

হাবিব

শ্যামল ব্যানার্জি

মানস ভট্টাচার্য

আই এফ এ শীল্ডের যুগ্মজয়ী আরারাত দল

ফোটো সন্তোষ ঘোষ

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবার কিন্তু প্যাস্টেল দিয়ে ফুল-পাতা নয়। একই প্যাস্টেলের টুকরো দিয়ে একই সঙ্গে পরপর অনেক-গুলো লাইন টানা খুব সোজা। তোমার ইচ্ছেমতো চওড়া প্যাস্টেলের টুকরো নাও আর দরকার-মতো ফাঁক রেখে তার গায়ে ছুরি বা ব্লেড দিয়ে খাঁজ কেটে নিয়ে সাদা কাগজে চাপ দিয়ে টান দিলেই দেখবে, এক-টানে অনেক রেখা বেরিয়ে আসছে। এইবার এই এক-টানে অনেক রেখা দিয়ে নানান কিছু করার জন্যে মাথা ঘামাও।

কারিগর

বাঁশের কাজ—হাতের বালা

জোগাড় করা জিনিস দিয়েই শুরু করো। বালার মাপ অনুযায়ী বাঁশ বেছে তাকে দিন-কয়েক জলে ভিজিয়ে নিয়ে নক্‌শা-মাফিক গোল-গোল টুকরো কেটে নাও। এখানে যে নমুনা তোমাদের দেখিয়েছি, সেইমতো খাঁজ (১নং) কেটে বাহার আনতে পারো। ২নং ছবির নকশা-ছাড়া বালা করতে চাইলে প্রথমে বালাকে ভালভাবে মাজাঘষা করে নিয়ে তার গায়ে যে-কোনো তেল মাখিয়ে নিয়ে মোমের বা প্রদীপের শিখায় ধরে আস্তে-আস্তে ঘোরাতে থাকলে দেখবে, বালা আপনা থেকে তামাটে রঙে ভরে উঠছে। তোমার পছন্দমতো রঙের কম-বেশি করতে পারো। ৩নং ছবির মজা হল—বালার গায়ে ফেভিকল লাগিয়ে, তার ওপর তোমার নকশা-মাফিক নানান রঙের পুঁতি, চুমকি, আয়না-কাঁচ বসিয়ে ঝলমলে জড়োয়া-গহনা করে নিতে পারো। ৪নং বালার গায়ের কাজ করা হয়েছে বাঁশের সরু টুকরো দিয়েই। নানান নক্‌শায় ভরে তুলতে পারলে এরও তুলনা নেই। যে ধরনেরই বালা করো না কেন, সব সময় বাহারের দিকে নজর রাখবে।

জেনে রাখো—(১) মাপ বলতে হাতের ফাঁদের মাপ। (২) বাঁশ বাছার সময় মাপের সঙ্গে-সঙ্গে পুরু হওয়ার দিকে নজর রাখবে। (৩) একা আগুনে কাজ করবে না। (৪) আগুনের তাত এমন হবে, যাতে বাঁশ পুড়বে না অথচ রঙ ধরবে। (৫) খাঁজ কেটে কাজের সময় বেশি চাপ দিলে ফেটে যেতে পারে। (৬) বালার দু-পাশের মুখ বেশ গোলভাবে মেজে না দিলে হাত কাটতে পারে। (৭) ভেজা বাঁশে নক্‌শা কাটা চলবে, কিন্তু মাজাঘষার সময় শুকনো চাই। (৮) ফেভিকল দিয়ে কাজ করার পর তা শুকোবার জন্যে একদিন সময় দিতে হবে।

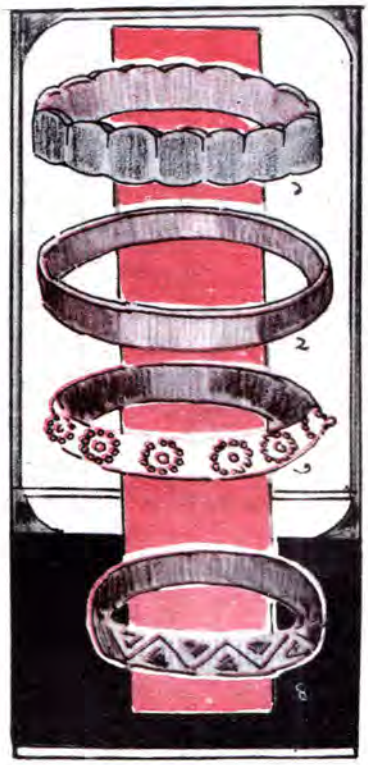

ভারত ও জার্মানী
সহযোগিতার একটি আদর্শ

ভারত ও ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানীর কূটনৈতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গত ২৫ বছরে একটি উচ্চ শিল্পোন্নত দেশ এবং তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের মধ্যে সহযোগিতার একটি আদর্শ চরিত্র গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান এই বিশেষ সম্পর্কটিকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

১। বাণিজ্য	১৯৬১	১৯৭৭
	ডিএম/মিলিয়ন	ডিএম/মিলিয়ন
জার্মানীতে ভারতীয় রপ্তানী	২২২.৯	৭৮৬.৩৩
ভারতে জার্মানী থেকে আমদানী	৭৮০.০	১১৪০.৭৪

ভারত-জার্মান বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিমাণ ভারতের অনুকূলে প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছে।

২। বিকাশমূলক সহযোগিতা	১৯৭২/৭৩	১৯৭৭/৭৮
দ্বিপাক্ষিক সরকারী আর্থিক সহায়তা (আন্তর্জাতিক বিকাশ সংস্থার শর্তে প্রদত্তঃ ৫০ বছরে পরিশোধযোগ্য, ১০ বছরের ছাড়সহ ০.৭৫ টাকা সুদে)	ডিএম/মিলিয়ন ২৮০	ডিএম/মিলিয়ন ৩৬০
বহুপাক্ষিক সহযোগিতা		২৭৩.৫ (সাকুল্যে ১৯৭৬ পর্যন্ত)
বেসরকারী লগ্নী		১৭৮.৫ (সাকুল্যে ১৯৭৬ পর্যন্ত)

৩। সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা সম্বন্ধী বিনিময়

ভারতে অবস্থিত সাতটি মাক্স মুলার ভবন ভারত ও জার্মানীর মধ্যে গভীরতর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে' তোলার কাজে সক্রিয় থেকে ২০ বছর পূর্ণ করেছে। প্রযুক্তিবিদ্যা এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য জার্মান শিক্ষা বিনিময় পরিসেবা বৃত্তি প্রদান করেছে। জ্ঞানের বিনিময়, গবেষণা প্রকল্পগুলির সংগে সহযোগিতা এবং মাদ্রাজস্থিত ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অফ টেকনোলজি-কে প্রদত্ত সরাসরি সহযোগিতা এত উল্লেখযোগ্য হয় যে, আই আই টি, মাদ্রাজ, জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী গেনশার-কে 'ডক্টর'-এর সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করে।

দি ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানী
এক নির্ভরযোগ্য সহযোগী

ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানীর কনসুলেট জেনারেলের তথ্য ও সংবাদ বিভাগ
১, হেস্টিংস পার্ক রোড, কলিকাতা-২৭ কর্তৃক প্রচারিত।

রাম ও শ্যাম

ফিল্ম দেখতে গেল

খেতে ভাল দেখতে ভাল
ভাবতে ভাল

পার্লে

পপিন্স

মিষ্টি ফলার পার্লে পপিন্স

৫ রকম ফলের স্বাদে
ভরপুর— রাস্‌বেরী, আনারস, লেবু,
কমলালেবু ও মুসম্বী।

everest/78/PP/165-bn